একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের আহ্বান

কর্পোরেট-হিন্দুত্বের আঁতাতের বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলুন

'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' নামে পরিচিত নবদ্বীপ। ষোড়শ শতাব্দীর বাংলায় শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন সাধনা সাম্প্রদায়িক ধর্মকে চূড়ান্ত আঘাত হেনেছিল। ২৩ জুন, ১৭৫৭ পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হওয়ার মতো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল যে জেলায়, সেই নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে গত ১০-১২ জানুয়ারী, ২০২৬ অনুষ্ঠিত হলো পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন। রাজ্যের লুটে খাওয়াদের বিরুদ্ধে খেটে খাওয়াদের সম্মিলিত সংগ্রামে পূর্ণশক্তি নিয়ে অংশগ্রহণের শপথ নিল একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সংগ্রামী প্রতিনিধিরা।

শান্তিপুর-ফুলিয়ার তাঁত, কল্যাণীতে আধুনিক শিল্প এবং কৃষ্ণনগরে মাটির পুতুলের জন্য প্রসিদ্ধ জেলা নদীয়ায় ৪৩ বছর পর দ্বিতীয়বার রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। গত ২৭-৩০ ডিসেম্বর, ১৯৮২, প্রথমবার কৃষ্ণনগরে সপ্তম রাজ্য

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক (পুনর্নির্বাচিত)

সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। একুশতম রাজ্য সম্মেলন সফল করতে গত ৬ মে, ২০২৫ একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়েছিল এবং ওইদিনই দানমেলায় ৬ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছে। এই সম্মেলনকে সফল করতে জেলার শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, ছাত্র-যুব-মহিলা সংগঠনগুলি আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছে।

প্রবীর মুখার্জী (প্রাক্তন সহ সম্পাদক)

গত ৯ জানুয়ারী, ২০২৬ রাজ্য সম্মেলন সফল করার আহ্বান জানিয়ে একটি বর্ণাঢ্য মিছিল কৃষ্ণনগর শহর পরিক্রমা করে। সম্মেলন স্থল (কমরেড প্রণব চট্টোপাধ্যায় নগর এবং কমরেড প্রশান্ত সাহা মঞ্চ, সেন্ট জনস হাউস) থেকে মিছিল বেরিয়ে দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে। মিছিলের প্রথমেই ছিল স্ক্যাটার টিম ও বিভিন্ন ধর্মের পোশাকে সম্প্রীতির বার্তা বহনকারী সংগঠনের কর্মীরা। দাবি সম্বলিত পোস্টার হাতে শ্লোগান মুখরিত লালপতাকা সজ্জিত মিছিলকে পুষ্প দিয়ে বরণ করে নেন রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যরা। দীর্ঘ মিছিলে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব, সমিতির নেতৃত্ববৃন্দ, অভ্যর্থনা কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন স্থলের প্রবেশ তোরণ বিখ্যাত অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণে উৎসর্গ করা হয়।

ওইদিন সম্মেলন প্রাঙ্গণে কমরেড অভিজিৎ দাস নামাঙ্কিত প্রগতিশীল পুস্তক বিপণন কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন

দেবব্রত রায়, যুগ্ম সম্পাদক (পুনর্নির্বাচিত)

পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক ন্যায় মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক অলকেশ দাস। বুক স্টল উদ্বোধনী সভায় সভাপতিত্ব করেন সভাপতি মানস দাস। প্রাথমিক বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। অলকেশ দাস তাঁর বক্তব্যে বর্তমান পরিস্থিতি এবং বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করেন।

১০ জানুয়ারী, ২০২৬ সকাল ৯টায় রক্তপতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের সভাপতি মানস দাস। এরপর তিনি ও অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন।

অশোক ধাওয়ালে (উদ্বোধক)

উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। সম্মেলন পরিচালনা করার জন্য মানস দাস, রবীন্দ্রনাথ সিংহ রায় এবং নিবেদিতা দাশগুপ্তকে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়। শোক প্রস্তাব পাঠ করেন মানস দাস। সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কর্মী এবং অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি বাদল দত্ত।

একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সারা ভারত কৃষক সভার সভাপতি অশোক ধাওয়ালে। তিনি আমেরিকার ভেনেজুয়েলার উপর সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের এবং এই ঘটনায় ভারত সরকারের নীরবতার নিন্দা করেন। পাশাপাশি আমাদের দেশে কর্পোরেট হিন্দুত্বের আঁতাতের বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক মনোজ সাউ, পঞ্চায়েত যৌথ কমিটির পক্ষে সন্দীপ রায়, এ বি পি টি এ-র পক্ষে মোহন দাস পণ্ডিত, স্টিয়ারিং কমিটির পক্ষে পার্থপ্রতিম দে, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির পক্ষে তাপস সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী কনফেডারেশনের পক্ষে অঞ্জন ঘোষ, সি আই টি ইউ, নদীয়া জেলার সাধারণ সম্পাদক এস এম সাদি, কেন্দ্রীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অন্বেষা বিশ্বাস, নদীয়া জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ পলিটেকনিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী ইউনিয়নের পক্ষে দেবাশীষ কুণ্ডু।

উদ্বোধনী অধিবেশনের পর শুরু হয় প্রতিনিধি অধিবেশন। গঠিত হয় স্টিয়ারিং কমিটি, মাইনুটস কমিটি, ক্রেডেনসিয়াল কমিটি। প্রতিনিধি অধিবেশনে সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন পেশ করেন যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত রায়। আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব পেশ

এ. শ্রীকুমার (বিশেষ অতিথি)

করেন কোষাধ্যক্ষ লিটন পান্ডে। ২৩টি দাবি প্রস্তাব একত্রে পেশ করেন অন্যতম সহ সম্পাদক প্রণব কর এবং সমর্থনে বক্তব্য রাখেন আরেকজন সহ-সম্পাদক শাশ্বতী মজুমদার। শ্রমকোড বাতিলের দাবিতে এবং আগামী ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট সফল করার লক্ষ্যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য সুতপা হাজরা, সমর্থনে বক্তব্য রাখেন অন্যতম সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বিদ্যুত দাস। সংগঠনের নিয়মাবলীর সংশোধনী ও সংযোজনীর উপর প্রস্তাব পেশ করেন দপ্তর সম্পাদক প্রশান্ত চন্দ এবং সেটি সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করা হয়।

সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন, আয়-ব্যয়ের হিসাব সহ প্রস্তাবাবলীর উপর উপস্থিত ৬৭০ জন (৮৮ জন মহিলা সহ) প্রতিনিধির মধ্যে ৬৫ জন (৪ জন মহিলা সহ) প্রতিনিধি তিনদিন ধরে আলোচনা করেন।

সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এ শ্রীকুমার। তিনি বলেন, শ্রমকোড নয়া উদারবাদী আর্থিক নীতির অংশ। এর বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে। স্বাধীনতা-আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আজ পশ্চিমবাংলার কী অবস্থা? পশ্চিমবঙ্গে যেমন বিজেপি-তৃণমূল আঁতাত করে চলছে, তেমনি কেরালাতে বিজেপি-কংগ্রেস আঁতাত করে চলছে। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত বেকাররা চাকরি পাচ্ছে না। স্থায়ী পদে কিছু চুক্তির কর্মচারী নিয়োগ হচ্ছে। নিয়োগে দুর্নীতি হচ্ছে। কেরালা সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি করে চলেছে। প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারাই যোগ্য নেতৃত্ব, আপনারাই পারবেন পরিবর্তন আনতে।

সম্মেলনে আরো একজন বিশেষ অতিথি ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী সমন্বয় কমিটি (এইচ বি রোড)-এর সাধারণ সম্পাদক

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের

যৌথ মঞ্চ

সংগ্রামী যৌথমঞ্চ ও অন্যান্য সংগঠনগুলির আহ্বানে

বকেয়া মহার্ঘভাতার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে অবিলম্বে কার্যকরী করার দাবিতে।

সকল স্তরের অনিয়মিত শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও কর্মচারীদের অবিলম্বে নিয়মিতকরণ করার দাবিতে।

শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও কর্মচারীদের

প্রত্যাঘাত ধর্মঘট

১৩ মার্চ ২০২৬

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

সংগ্রামী হাতিয়ার

ডিসেম্বর ২০২৫-জানুয়ারী ২০২৬

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

তেপান্নতম বর্ষ ☐ অষ্টম ও নবম সংখ্যা ☐ মূল্য ঃ ৪ টাকা

সম্পাদকীয়

রাজ্য সম্মেলন থেকে প্রতিরোধের স্তর পেরিয়ে প্রত্যাঘাত হানার প্রত্যয় ঘোষিত হলো

এই বছরের শুরুতেই ১০ থেকে ১২ জানুয়ারী, ২০২৬ নদীয়ার কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন। অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে এক নতুন ভোরের আকাঙ্ক্ষা নিয়েই এই সম্মেলন সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এর আগে ১৯৮২ সালে প্রথমবারের জন্য কৃষ্ণনগর শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সংগঠনের সপ্তম রাজ্য সম্মেলন। সময়টা কেমন ছিল? এক নতুন পরিস্থিতিতে রাজ্যের বুকে গণ আন্দোলনের তীব্র ও উচ্ছল তরঙ্গ শীর্ষে ১৯৭৭ সালে রাজ্যে গঠিত হয়েছিল প্রথম বামফ্রন্ট সরকার। বিকল্প ভাবনার এই সরকারকেই দ্বিতীয়বারের জন্য ১৯৮২ সালের মে মাসেই বিপুল ভাবে পুনর্নির্বাচিত করেছে রাজ্যের মানুষ। একদিকে গ্রামীণ বাংলায় পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও উন্নয়ন, আমূল ভূমিসংস্কার (অপারেশন বর্গা) গ্রাম বাংলার অর্থনীতিতে এক নতুন জোয়ারের সূত্রপাত ঘটাচ্ছে, অপর দিকে কর্মচারী সমাজ 'Govt. Servant'-এর পরিবর্তে 'Govt. Employee'-র মর্যাদা নিয়ে যুক্ত হচ্ছে এই বিপুল উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে, একই সাথে একে একে অর্জন করছে দীর্ঘ আন্দোলনের দাবিগুলিকে। স্বাধীনতার ২৫ বছরে রাজ্যের মানুষের পাশাপাশি সরকারী কর্মচারী সমাজও এক বিকল্প রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিনির্মাণের সাক্ষী হচ্ছেন। একই সাথে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তীব্র গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে জরুরি অবস্থার অবসান, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি গড়ে ওঠার পাশাপাশি নবরত্নগুলি গড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে দেশের অভ্যন্তরে নগরায়ণের ব্যাপক বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের কারণে পশ্চাদপদ জাতি সহ দলিতদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি দেশের মধ্যেও এক প্রগতিশীল সমাজ গড়ে ওঠার নতুন নতুন উপাদান যুক্ত হচ্ছে।

আজকের সময়টা কেমন? দেশের চারটি ঘটনার দিকে আমরা নজর দেব।

প্রথমত, ৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ যখন দিল্লীর জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউ জি সি-র নতুন বিধির বিরুদ্ধে ছাত্র সংগঠনগুলি পূর্ণাঙ্গ আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও দমনপীড়নের নজিরবিহীন পদক্ষেপ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্র সংসদের চার পদাধিকারী সহ প্রাক্তন সভাপতিকে জরিমানা সহ দুটি সেমিস্টারের জন্য বহিষ্কার করেছে।

দ্বিতীয়ত, ওই দিনই সংসদে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারকে 'প্রশ্ন' করার অপরাধে বিরোধী দলনেতা সহ আটজন বিরোধী সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় বাজেটের দু'দিনের মধ্যেই দেশের সরকার মার্কিন সরকারকে 'শূন্য শুল্কের' তোফা দিলেন। ২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ার হ্যান্ডেলে পোস্ট করে জানান, প্রধানমন্ত্রী মোদীর সাথে তাঁর কথা হয়েছে। ভারতের সাথে দীর্ঘ বন্ধুত্বের কথা ভেবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তিতে তিনি রাজি হয়েছেন। ভারতের উপর আরোপিত পারস্পরিক শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করবেন তিনি, বিনিময়ে ভারত আমেরিকার উপর আরোপিত যাবতীয় শুল্ক ও শুল্ক বহির্ভূত বাধা শূন্যে নামিয়ে আনবে। দেশের শিল্প ও কৃষিকে আরও গভীর সঙ্কটে ঠেলে দেওয়ার জন্য এই একটি বাণিজ্য চুক্তিই যথেষ্ট বলে অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মতামত জানাচ্ছেন। 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-কে ঠান্ডা ঘরে পাঠিয়ে শুল্কমুক্ত মার্কিন পণ্য সুনামির মতো ভারতের বাজারে আছড়ে পড়বে। চূড়ান্ত বৈষম্যমূলক এই চুক্তির মধ্য দিয়ে দেশীয় শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এবং কৃষকরা আক্রান্ত হবে, রুজি-রোজগার হারাবে দেশের হাজার হাজার শ্রমিক। এপস্টাইন ফাইলস, ইউ জি সি বিজ্ঞপ্তি ও প্রাক্তন সেনাপ্রধান নারাভানের আত্মজীবনী বিতর্কে যখন সরকার সংসদের অভ্যন্তরে বিপাকে পড়ছে, তখন সরকারের 'বীরত্বের' ফানুস ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে গোদি মিডিয়া। এমন একটা সময়ে এই বাণিজ্য চুক্তির দিকে যাচ্ছে দেশের সরকার, যখন বাম সাংসদ ভি. শিবদাসনের প্রশ্নের উত্তরে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক জানিয়েছে, গত পাঁচ বছরে দেশে মোট ১ লক্ষ ৮৯ হাজার ২৯৫টি সংস্থা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী কোম্পানি আইনের ২৪৮(১) ধারা অনুযায়ী বিগত ২০২০-২১ ও ২০২২-২৩ আর্থিক বছরে লক্ষাধিক সংস্থার নাম রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের দাবি, এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের একের পর এক গৃহীত ভুল, জনবিরোধী ও হঠকারী সিদ্ধান্তসমূহ। প্রথমে নোটবন্দী যা দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে ধ্বংস করেছে, যার ক্ষত এখনও পূরণ হয়নি। তার উপর অবৈজ্ঞানিক জি এস টি কাঠামো ছোট ব্যবসায়ী ও উৎপাদন সংস্থাগুলিকে শ্বাসরোধ করেছে। সর্বশেষ এই ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি ক্ষুদ্র, ছোট দেশীয় ব্যবসায়ী, কৃষক, স্টার্ট আপ উদ্যোগপতিদের কফিনে শেষ পেরেকটি মারার ব্যবস্থা করেছে।

চতুর্থত, এই সময়ের অন্যতম আলোচিত প্রসঙ্গ, এস আই আর। কী বলে দেশের ইতিহাস? ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সাল, জন্ম নিল নতুন ভারত। ব্রিটিশ পরাধীনতার শিকল ভেঙে নির্মাণ হলো নতুন দেশ। কিন্তু দেশ চলবে কী করে? তার জন্য তৈরী হলো ভারতের সংবিধান, যা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন। এই সংবিধানে বহুকক্ষবিশিষ্ট সরকার ব্যবস্থা গঠন, কার্যপদ্ধতি, আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদ, গোত্রীয় স্বাতন্ত্র্যবাদ, লিঙ্গ ভিত্তিক ও সমকামী অধিকারত্ববাদ, ক্ষমতা ও কর্তব্য নির্ধারণ; মৌলিক অধিকার, নির্দেশমূলক নীতি এবং নাগরিকদের কর্তব্য নির্ধারণের মাধ্যমে দেশের মৌলিক রাজনৈতিক আদর্শের রূপরেখাটি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গণপরিষদে ২৮৪ জনের সই করার মাধ্যমে এই সংবিধান গৃহীত হয় এবং বহু বিতর্কের সমাধান ঘটিয়ে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারী থেকে এই সংবিধান সমগ্র দেশ জুড়ে কার্যকরী হয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতা, আরেকটু এগিয়ে রাজনৈতিক ন্যায় (Political Justice), অর্থাৎ একজন মানুষের একটি ভোট, আর এই একটি ভোটের মাধ্যমে সে নির্বাচিত করবে আগামী দিনগুলির জন্য দেশের সাংবিধানিক নেতা কে হবে। বিত্তবান/ মধ্যবিত্ত/ গরিব/ হতদরিদ্র/ হিন্দু / মুসলমান / খ্রিস্টান / জাতি / উপজাতি / তপশিলি সকলেরই একটি ভোট, অর্থাৎ রাজনৈতিক সমতার যাত্রা শুরু হলো। তাহলে এই নির্বাচনে এস আই আর-এর কী কাজ? কাজটা হলো এই নির্বাচকমণ্ডলীর তালিকাকে সময়োপযোগী করা। একজন নাগরিক নির্বাচক হিসাবে তাঁর নামটি এই তালিকায় তুলতে যতটা আগ্রহী বা সচেতন, পরিবারের প্রয়াত ব্যক্তি বা স্থানান্তরিত হওয়া ব্যক্তিদের এই তালিকা থেকে বিযুক্ত করার ক্ষেত্রে ততটা সচেতন কি? না, তাই নির্বাচক তালিকার ভার লাঘব করা প্রয়োজন একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর; একই সাথে ভুল, অসঙ্গতি বা ত্রুটিগুলি নির্মূল করা প্রয়োজন। এই কাজটাই করা হয় এস আই আর-এর মাধ্যমে, আর এই কাজটি করে নির্বাচন কমিশনের হয়ে বি এল ও সহ বিভিন্ন স্তরে কর্মরত আমাদের মতো সরকারী কর্মীরা। আমাদের দেশে গত এক দশক ধরে সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা ও হিংসা বৃদ্ধি পেয়েছে উত্তরোত্তর। সমাজ জীবনে জাতিগত বিদ্বেষের আগুনে ব্যাপক ঘৃণা মাথাচাড়া দিচ্ছে দেশের সর্বত্র। ধর্ম, ভাষা ও নাগরিকত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক নতুন করে তৈরী হচ্ছে দেশের অভ্যন্তরে। আর রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৈরী হচ্ছে নতুন নির্বাচনী ভাষ্য, তৈরী করা হচ্ছে নতুন রাজনৈতিক বাইনারি। এই প্রেক্ষাপটেই নেহাতই একটা প্রশাসনিক প্রক্রিয়া রাজ্য ও দেশ জুড়ে তৈরী করেছে আতঙ্কের পরিবেশ, তৈরী করছে নতুন এক বিভ্রান্তির পরিবেশ। সর্বশেষ খবর হলো এস আই আর প্রক্রিয়া আরও দীর্ঘায়িত হচ্ছে, নতুন করে আরও পঞ্চাশ লক্ষাধিক মানুষকে "Logical Discrepancy" শব্দবন্ধ ব্যবহার করে পুনর্বার প্রশ্নের সামনে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। আর রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্য ও কেন্দ্রের শাসকদলের মধ্যের বাইনারি মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। সেই লক্ষ্যেই 'অপটিক্যাল পলিটিক্স'-কে ব্যবহার করে রাজ্যের নেত্রী কালো কোট পরে হাজির হয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের অভ্যন্তরে। আর এর সাথে দেশজোড়া রাজনীতির অংশীদার হয়ে এই ঢক্কানিনাদে যুক্ত হচ্ছে দেশ ও রাজ্যের সংবাদমাধ্যম। মাঝখান থেকে এই দুই রাজনৈতিক দলের শ্যাডো ফাইটের মাঝে শ্বাসরোধ হচ্ছে সাধারণ কর্মচারীদের। কোন কর্মচারীদের? যে কর্মচারী প্রতিদিন প্রতিনিয়ত শোষিত, পদদলিত ও আক্রান্ত হচ্ছে এই প্রশাসনের অভ্যন্তরে, বহু লড়াইয়ে অর্জিত অধিকারগুলি যাদের প্রতিদিন কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, আক্রান্ত হচ্ছে যাদের পরিবার। তাদের আজ দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। কী করব আমরা? আমরা সমাজের শিক্ষিত অংশ কি এই সময়ে নাগরিকত্বের স্বীকৃতির তৃপ্তির ঢেকুর তুলে দিবানিদ্রায় লিপ্ত হব? নাকি এই পরিস্থিতিতে এই বিভ্রান্তি তৈরীর বিরুদ্ধে মানুষের পাশে দাঁড়াব! □

২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬

শোক সংবাদ

নারায়ণ দত্ত

দৈনিক গণশক্তি পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক নারায়ণ দত্তের জীবনাবসান হয়েছে। বার্ধক্য জনিত অসুস্থতার কারণে তিনি বেহালার বিদ্যাসাগর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। গত ২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ সকালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৯৬৭ সালে গণশক্তি পত্রিকার সূচনা থেকেই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন যুক্ত ছিলেন নারায়ণ দত্ত। ২০১৭ সাল পর্যন্ত তিনি গণশক্তি পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। তিনি বামপন্থী আন্দোলনের, বিশেষ করে সমাজ পরিবর্তনের যে আন্দোলন দরকার, তাতে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং অন্যতম পথপ্রদর্শক ছিলেন।

নারায়ণ দত্তের জীবন গণশক্তির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল পত্রিকার সূচনা থেকেই। তার জন্ম ১৯৪৪ সালের ১৫ জুন বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা নারায়ণগঞ্জে। তাঁর প্রতিবেশী দেশগুলিতে সমাজ বদলের জন্য আন্দোলনরত মানুষের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল অতি মধুর, বিশেষ করে বাংলাদেশের সাথে। 'শীতলাক্ষ নদীর' গল্প তিনি গণশক্তি পত্রিকার সহকর্মীদের কাছে বহুবার করেছেন। দেশভাগের পরবর্তী সময়ে তিনি পরিবারের অন্যান্যদের সাথে হাওড়ার কদমতলায় উঠে আসেন উদ্বাস্তু হয়ে। ছেলেবেলা থেকেই দারিদ্র্যের সাথে প্রবল সংগ্রাম করেছেন। সাতের দশকে আধা ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের সময় বেশ কিছুদিন এলাকা ছাড়াও ছিলেন। ১৯৬৭ সালে সান্ধ্য দৈনিক গণশক্তি যে অল্প কয়েকজন কর্মীকে নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নারায়ণ দত্ত। হ্যান্ড কম্পোজিটর, প্রুফ রিডার ও মনো অপারেটর হিসেবে তাঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ। তাঁর পত্রিকা ও প্রেসের দক্ষতা দেখে হাওড়া জেলার কম্যুনিস্ট আন্দোলনের পথিকৃৎ নরেশ দাশগুপ্তর হাত ধরে গণশক্তি পত্রিকায় প্রবেশ ঘটে। ১৯৮৬ সালের প্রভাতী দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের পর থেকে বহু সংস্করণ ইত্যাদির পথ তাঁর হাত ধরেই এগিয়েছে। প্রতিটি কাজ শেখার আগ্রহ ছিল প্রখর। কোনো কাজ তিনি ছোট হিসেবে দেখতেন না। তিনি প্রথমে গণশক্তি পত্রিকার বার্তা সম্পাদক এবং পরবর্তীতে সম্পাদকের দায়িত্ব সুনামের সহিত পালন করেছেন।

নারায়ণ দত্তর অমায়িক সুভদ্র বিনয়ী নম্র ব্যবহার ও আচরণের জন্য সহকর্মীদের মধ্যে তো বটেই, কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলা এবং দেশ ও বিদেশের সাংবাদিকদের মধ্যেও জনপ্রিয় ছিলেন তিনি। অনুজ সাংবাদিকদের হাতে কলমে কাজ শেখানো, সংবাদের সম্পাদনা ও লিখনশৈলী, নিউজ এজেন্সি প্রেরিত বিপুল সংবাদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সংবাদ চিহ্নিত করতে শেখানো ইত্যাদি ভূমিকার জন্য তিনি পরবর্তী প্রজন্মের সাংবাদিকদের কাছে আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন। সবার শ্রদ্ধা ও মান্যতা তিনি সহজেই অর্জন করতে পেরেছিলেন। ইন্টারনেটের বহু আগের সেই যুগেই তিনি আন্তর্জাতিক সংবাদ রচনায় বিশেষভাবে পারদর্শী ছিলেন। 'ইন্দ্র মিত্র' ছদ্মনামে তিনি গণশক্তি ও দেশহিতৈষী পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুজিবর রহমানের হত্যা সংক্রান্ত সংবাদ রচনায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি একসময় বাংলাদেশের নির্বাচন কভার করেছিলেন গণশক্তি পত্রিকার প্রতিনিধি হয়ে। চীন, ব্রাজিল, কিউবা সফরে গিয়ে সেখানকার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে নিয়মিত গণশক্তিতে প্রকাশও করেছিলেন। গণশক্তি পত্রিকার সংস্করণ কলকাতার পাশাপাশি একাধিক জেলা থেকে প্রকাশ এবং ওয়েবসাইট সংস্করণের জন্য তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর পর কমিউনিস্ট পার্টি সহ বামফ্রন্টের বিভিন্ন নেতৃত্ব, বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু এবং গণশক্তির কর্মীরা মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। কেওড়াতলা মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং পত্রিকার অবদানকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করেছেন বিভিন্ন গণআন্দোলনের নেতৃত্ব। কলকাতা প্রেসক্লাব, ত্রিপুরার ডেইলি দেশের কথা-র পক্ষ থেকে গভীর শোক জ্ঞাপন করা হয়েছে।

মৃত্যুকালে তিনি তাঁর স্ত্রী শিখা দত্ত ও পুত্র রিচিক দত্তকে রেখে গেছে গিয়েছেন। □

অর্ঘ্য সেন

রবীন্দ্র ভুবনে ইন্দ্রপতন। প্রয়াত হলেন বর্ষীয়ান রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী অর্ঘ্য সেন। গত ১৪ জানুয়ারী, ২০২৬ সকাল ৭টা নাগাদ কলকাতায় নিজের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে যাঁদের জীবন একাকার হয়ে গিয়েছিল, তাঁদের মধ্যে অর্ঘ্য সেন ছিলেন এক অনন্য উজ্জ্বল নক্ষত্র। ১৯৩৫ সালের ১১ নভেম্বর, তৎকালীন বাংলার ফরিদপুরে (বর্তমান বাংলাদেশ) মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন অর্ঘ্য সেন। আদি নিবাস খুলনার সেনহাটি গ্রামে। বাবা হেমেন্দ্রকুমার সেন ছিলেন কৃষি বিজ্ঞানের শিক্ষক, আর মা বিষ্ণু দেবী সঙ্গীতের গভীর অনুরাগী।

ছোটবেলায় বাড়িতে রবীন্দ্র গানের পরিবেশেই বড় হয়েছেন। ফলে তাঁর সঙ্গীত শিক্ষা শুরু বাড়িতেই। পরে তিনি দেবব্রত বিশ্বাস ও অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা নেন। রবীন্দ্র সঙ্গীতের যে শুদ্ধ, নির্মল ও অন্তর্মুখী ধারা, তা অর্ঘ্য সেনের কণ্ঠে যেন নতুন মাত্রা পেয়েছিল। তাঁর গাওয়া 'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে', 'তুমি রবে নীরবে', 'পুরানো সেই দিনের কথা' কিংবা 'যদি তারে নাই চিনি গো' প্রতিটি গানেই ছিল এক অপূর্ব সংযম ও গভীরতা। রবীন্দ্র সঙ্গীতের জন্য তিনি ১৯৯৭ সালে সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন।

সঙ্গীত চর্চার পাশাপাশি ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট্রে কর্মজীবন শুরু করে, পরবর্তী সময়ে ন্যাশানাল স্যাম্পল সার্ভে অর্গানাইজেশন-এ দীর্ঘদিন কাজ করেন। কিন্তু এরপরও রবীন্দ্র সঙ্গীতকে আঁকড়ে বেঁচেছিলেন তিনি। বাঙালির হৃদয়ে যতদিন রবীন্দ্রনাথ থাকবেন, ততদিন অর্ঘ্য সেনও থাকবেন নীরবে, চিরকালের মতো। □

গোপাল চ্যাটার্জী

রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের প্রাক্তন নেতৃত্ব গোপাল চ্যাটার্জী প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। গত ২২ জানুয়ারী, ২০২৬ ই. এম. বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারী হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হন এবং সেখানেই তাঁর জীবনাবসান হয়।

হরিদেবপুরের বনমালী ব্যানার্জী রোডে বসবাস করতেন তিনি। জন্ম ১৯৫০ সালের ১ জানুয়ারী। তিনি চেতলার কৈলাস বিদ্যামন্দির থেকে ১৯৬৫ সালে উচ্চমাধ্যমিক এবং নিউ আলিপুর কলেজ থেকে ১৯৬৮ সালে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক হওয়ার পর ১৯৭১ সালে নিউ জলপাইগুড়ি পি.এ.ও. অফিসে মেটিওরোজিক্যাল পদে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে ১৯৮৯ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কৃষি দপ্তরে বদলি হয়ে আসেন।

কর্মজীবনে রাজ্য সরকারী কর্মচারী হিসেবে প্রশাসনিক দক্ষতার পাশাপাশি নিজের সমিতির (W.B.M.O.A.) নেতৃত্ব দেওয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির কোষাধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্বে ছিলেন। কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্বে তাঁর ভূমিকাও ছিল অতুলনীয়।

২০০৯ সালে অবসরের সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতিতে যোগদান করেন এবং পরবর্তীকালে সহ-সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক ও পরে সভাপতি হয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি পেনশনার্স সমিতির সভাপতি ছিলেন। আজীবন সমাজ বদলের দর্শনে দৃঢ় অবস্থান, সাংগঠনিক দক্ষতা, বিনম্র স্বভাব, সদালাপী, মিষ্ঠভাষী, অনুগামীদের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক, অনুকরণযোগ্য নেতৃত্ব ইত্যাদি গুণ ছিল তাঁর। তাঁর আকস্মিক জীবনাবসানে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন কর্মচারী আন্দোলনের রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও পেনশনার্স সমিতির নেতৃবৃন্দ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতি বর্তমান। □

সুকান্ত চৌধুরী

একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধকের ভাষণ

সংগঠনকে শক্তিশালী করে সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষকে সাথে নিয়ে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তুলে দেশ তথা রাজ্য পরিবর্তনের লড়াইতে শামিল হতে হবে

গত ১০-১২ জানুয়ারী, ২০২৬ প্রণব চট্টোপাধ্যায় নগরের (কৃষ্ণনগর শহর) প্রশান্ত সাহা মঞ্চে অনুষ্ঠিত রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সারা ভারত কৃষক সভার সভাপতি অশোক ধাওয়ালে। সম্মেলন উদ্বোধন করতে এসে তিনি বলেন ঃ

শুরুতেই, নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে এই সুন্দর সম্মেলন আয়োজন করার জন্য এবং আমাকে এই সম্মেলন উদ্বোধনের জন্য আমন্ত্রণ জানানোয় আমি আপনাদের সকলকে অভিনন্দন জানাই। আমাকে বলা হয়েছে ইংরেজি এবং হিন্দি মিশিয়ে বক্তব্য রাখতে, কারণ আমি বাংলা জানি না। তাই আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব।

প্রথমেই বলি, সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের ধারক এই পশ্চিমবঙ্গে এসে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি খুব খুশি যে আপনারা এখানে চারটি ছবি রেখেছেন ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, সলিল চৌধুরী—যাঁর জন্মশতবর্ষ আমরা সম্প্রতি পালন করলাম এবং বিপ্লবী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। বাংলায় সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক এবং মৃণাল সেনের মতো আরও অনেক প্রগতিশীল শিল্পী ও সাহিত্যিক জন্মেছেন, যাঁরা বাংলাকে আজকের এই অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের পাশাপাশি, বাংলার রয়েছে শহীদদের রক্তে রাঙা এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদরা, এবং স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে শাসক শ্রেণীর দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে লড়ে যাওয়া শহীদরা। আমরা ক্ষুদিরাম বসু, বাঘা যতীন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের মতো আইকনদের কথা স্মরণ করি—যাঁকে ব্রিটিশরা হত্যা করেছিল কারণ তিনি 'মাস্টারদা' সূর্য সেনের নেতৃত্বে থাকা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অংশ ছিলেন। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই—এটাই পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্য। শত শত বাঙালি আন্দামান জেলে জীবন কাটিয়েছেন—যাকে 'কালাপানির সাজা' বলা হতো। তাঁদের কেউই বিনায়ক দামোদর সাভারকরের মতো ব্রিটিশদের কাছে কোনো দয়ামায়ার আবেদন বা মুচলেকা (Mercy Petition) দেননি। সাভারকর ব্রিটিশদের কাছে একটা নয়, পাঁচ-পাঁচটা মুচলেকা দিয়েছিল। আর আজ পরিস্থিতি এমন যে, আন্দামানের বিমানবন্দরটির নামকরণ করা হয়েছে এমন এক ব্যক্তির নামে যে ব্রিটিশদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, যে মুচলেকা দিয়েছিল! অথচ বাংলার সতীশ পাকড়াশী, হরেকৃষ্ণ কোঙারের মতো সাহসী নেতারা, যাঁরা বছরের পর বছর জেলে কাটিয়েছেন, শাসকরা তাঁদের ভুলে গেছে। আর ওই কাপুরুষের নামে আজ সেখানে নামকরণ করা হয়েছে! এই হলো বাংলার আসল ঐতিহ্য। তেভাগা আন্দোলন। পূর্ববর্তী কংগ্রেস সরকারের আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে ১২০০-রও বেশি মানুষ প্রাণ দিয়েছেন। এবং এই বলিদানের ইতিহাস সেখানেই শেষ হয়নি। গত ১৪ বছরে, তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে, লাল ঝান্ডাকে বাঁচাতে গিয়ে শত শত কমরেড শহীদ হয়েছেন। এই সমস্ত আত্মত্যাগ আমরা কোনোদিন ভুলব না। আর আজ আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলছি---এই স্বৈরাচারের দিন, এই সাম্প্রদায়িকতার দিন, আর এই কর্পোরেটদের চামচাগিরি করার দিন শেষ হবেই, এবং আবার 'সোনার বাংলা' জেগে উঠবে—এতে কোনো দ্বিমত নেই!

কমরেডস্ ও বন্ধুরা, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির এক গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। আমার মনে পড়ছে

উদ্বোধক অশোক ধাওয়ালে

ভারতের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলনের অন্যতম শীর্ষ নেতা, বাংলা থেকে উঠে আসা সর্বভারতীয় নেতা কমরেড সুকোমল সেনের কথা। তিনি কেবল কর্মচারীদের নেতাই ছিলেন না, ছিলেন এক বিশাল মাপের বুদ্ধিজীবী। ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাস নিয়ে লেখা তাঁর বই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে পাঠ্যপুস্তক হয়ে আছে। রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব নিয়ে তাঁর লেখা খণ্ডগুলো অত্যন্ত মূল্যবান। তাই বাংলা থেকে যেমন অনেক নেতা সারা ভারত পেয়েছে, ভারত থেকেও বাংলা অনেক কিছু পেয়েছে।

আমি জানি আপনারা কী কী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। আমাদের কমরেডরা আজ সকালেই আমাকে বলেছেন, আর এই সমস্যাগুলো শুধু বাংলার নয়, সারা দেশের। রাজ্য সরকারী চাকরিতে কোনো নতুন নিয়োগ নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতেও কোনো নতুন নিয়োগ নেই। এর ফলে যাঁরা চাকরিতে আছেন, তাঁদের ওপর কাজের চাপ সাংঘাতিকভাবে বাড়ছে। স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা কমছে, আর চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীর সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। এটি কর্মচারী এবং বাংলার সাধারণ মানুষ—উভয়ের জন্যই এক বিশাল সমস্যা তৈরী করছে, কারণ মানুষ তাঁদের প্রাপ্য পরিষেবা পাচ্ছেন না। বেতন কমিশন বা পে-রিভিশন নেই, বকেয়া ডি.এ. (DA)-র সমস্যা—এই সব সমস্যা আজ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। একদিকে রাজ্য সরকারের নীতির কারণে বাংলায় এই অবস্থা, অন্যদিকে বিজেপি সরকারের নীতির কারণে কেন্দ্রীয় কর্মচারীদেরও একই দশা। যাই হোক, আপনাদের নেতারা এই বিষয়গুলো নিয়ে আমার চেয়ে ভালো বলবেন। আমি কিছু অন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলতে চাই।

কমরেডস্ ও বন্ধুরা, আজ আমরা দেশ ও দুনিয়া জুড়ে এক অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। গত সপ্তাহে আমরা এমন কিছু দেখেছি যা আগে কখনো ঘটেনি। ভেনেজুয়েলায় কী হলো? ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে আমেরিকা কারাকাসে সামরিক অভিযান চালিয়ে ভেনেজুয়েলার নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি নিকোলাস মাদুরোকে—যিনি মহান হুগো শ্যাভেজের উত্তরসূরী—তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রীকে অপহরণ করে নৌকায় তুলে, প্লেনে করে নিউ ইয়র্কে নিয়ে গিয়ে জেলে ভরেছে! তাঁর বিরুদ্ধে মাদক-সন্ত্রাসের সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে। এর আগে এমন ঘটনা কখনো দেখা যায়নি। হ্যাঁ, এর চেয়ে খারাপ ঘটনা ঘটেছে। আমেরিকা চিলিতে সালভাদর আলেন্দেকে হত্যা করেছে। ইরাকে সাদ্দাম হোসেনকে হত্যা করেছে। লিবিয়ায় মুয়াম্মার গদ্দাফিকে হত্যা করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এমন কোনো দেশ নেই যারা আমেরিকার আগ্রাসন থেকে রেহাই পেয়েছে। আর এখন ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে। শুধু তাই নয়, গত আড়াই বছর ধরে গাজায়, প্যালেস্টাইনে ইজরায়েল, আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপের এক অশুভ আঁতাতের মাধ্যমে যে নৃশংসতা চলছে তা আমরা দেখছি। ৭৫,০০০-এরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে, যার ৬০ শতাংশই নারী ও শিশু। এটা আজ দুনিয়ায় ঘটছে। আর এই সাম্রাজ্যবাদের নয়া রূপ আজ সারা বিশ্বের ওপর নেমে আসছে 'ট্যারিফ ওয়ার' বা 'শুল্ক যুদ্ধ'-এর মাধ্যমে। আমরা একে বলি "ট্রাম্পের ট্যারিফ সন্ত্রাস"। ভারতের ওপরও এর আঁচ পড়েছে। আমেরিকায় যাওয়া ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০% শুল্ক চাপানো হয়েছে। আর সর্বশেষ ঘোষণা কী? ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন—যেসব দেশ রাশিয়া থেকে তেল কিনবে, তাদের ওপর ৫০০% শুল্ক চাপানো হবে! আপনারা নিশ্চয়ই খবরে দেখেছেন—৫০০ শতাংশ ট্যারিফ! এর মানে ভারতের কোনো পণ্য আমেরিকায় বিক্রিই হতে পারবে না। কারণ কী? আমরা সস্তায় রাশিয়ার তেল কিনছিলাম। এখন ট্রাম্প চাপ দিচ্ছে যাতে আমরা সেটা ছেড়ে আমেরিকার দামী তেল কিনি।

কমরেডস্ ও বন্ধুরা, আমাদের দেশের প্রতিক্রিয়া কী? ভেনেজুয়েলা, প্যালেস্টাইন, ট্যারিফ—এই তিন বিষয়ে মোদী সরকারের কী প্রতিক্রিয়া? সারা দুনিয়া ভেনেজুয়েলায় আমেরিকার কর্মকাণ্ডের নিন্দা করেছে। চীন, রাশিয়া তো বটেই, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশগুলোও নিন্দা করেছে। কিন্তু ভারত সরকারের ট্রাম্প বা আমেরিকার নিন্দা করার সাহসটুকু নেই! তারা বলছে, "আমরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি"। যে মাদুরোকে অপহরণ করা হলো, তাঁর জন্য নয়, ভেনেজুয়েলার মানুষের জন্য উদ্বেগ! দাসত্বের চরম সীমা! প্যালেস্টাইনে ৭৫,০০০ মানুষ মারার জন্য ইজরায়েল বা আমেরিকার বিরুদ্ধে একটা নিন্দাসূচক শব্দও নেই। উল্টে মোদীর বন্ধু কর্পোরেটরা---আম্বানি আর আদানি---ইজরায়েলের সঙ্গে ড্রোন বানানোর চুক্তি করছে মানুষ মারার জন্য। আর ট্যারিফ? আপনারা দেখেছেন ট্রাম্প কী বলেছে—"মোদী আমার কাছে এসে বলে, প্লিজ স্যার, আমি কি আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি?" আর এই মোদীই নির্বাচনের আগে আমেরিকায় গিয়ে প্রবাসী ভারতীয়দের সভায় স্লোগান দিয়েছিল—"আব কি বার, ট্রাম্প সরকার"। আর এস এস আর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের লোকেরা কী করে? যজ্ঞ করে! ট্রাম্প যাতে জেতে, তার জন্য ভারতে যজ্ঞ করা হয়! কমলা হ্যারিস হারলে এদের আনন্দ! আর এখন সেই ট্রাম্পই আপনাদের ওপর ৫০০% শুল্ক চাপাচ্ছে। খুব ভালো হলো? ট্রাম্পকে চেয়েছিলেন না? নিন এখন ট্রাম্প! মোদী এখন মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন। অন্যদিকে চীন কী করেছে দেখুন। আমেরিকা যখন চীনের ওপর ১৫০% শুল্ক চাপাল, চীন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পাল্টা আমেরিকার পণ্যের ওপর ১৫০% শুল্ক চাপিয়ে দিল। আর সেই সাহসের ফলে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পিছু হটতে হলো। চীনের এই সাহস কেন? কারণ চীন চালায় কমিউনিস্ট পার্টি, আর ভারত চালায় বিজেপি আর আর এস এস---যাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে কোনো ভূমিকা ছিল না। স্বাধীনতা সংগ্রামে সবাই অংশ নিয়েছিল, কেবল তিনটি সাম্প্রদায়িক সংগঠন ছাড়া ঃ ১) আর এস এস, ২) হিন্দু মহাসভা, ৩) মুসলিম লিগ।

১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় বাংলায় এক অদ্ভুত সরকার ছিল। মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন মুসলিম লিগ নেতা সোহরাওয়ার্দী, আর উপ-মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন হিন্দু মহাসভা নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। এই সরকারই বাংলায় ৪২-এর আন্দোলনকে রক্তে ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিল।

যাই হোক, আজ ভারতে আমরা নয়া-উদারবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার এক দ্বিমুখী আক্রমণের শিকার। আমাদের সামনে চারটি বড় বিপদ দাঁড়িয়ে আছে ঃ ১) নয়া-উদারবাদ, ২) সাম্প্রদায়িকতা, ৩) মনুবাদ, এবং ৪) স্বৈরতন্ত্র। এই চারটির যোগফল হলো—নয়া-ফ্যাসিবাদ (Neo-fascism)। এটাই আজ দেশের সামনে সবচেয়ে বড় বিপদ। এর ফলেই সরকারী চাকরিতে নিয়োগ বন্ধ। ব্যাঙ্ক, এলআইসি, জিআইসি—কোথাও স্থায়ী চাকরি নেই। সব জায়গায় চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ হচ্ছে। শিক্ষকরাও আজ ক্লক-আওয়ার বেসিসে কাজ করছেন।

শ্রমজীবী মানুষের সামনে আজ তিনটি বড় চ্যালেঞ্জ ঃ

প্রথমত, লেবার কোড ঃ ৪টি শ্রম কোড বা লেবার কোড মোদী সরকার কার্যকর করেছে, যার ফলস্বরূপ শ্রমিকরা মালিকদের দাসে পরিণত হবে। ইউনিয়ন করার অধিকার নেই, ৮ ঘণ্টা কাজের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। শিকাগোর শহীদরা যে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবির জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন, তা কেড়ে নিয়ে ১২-১৪ ঘণ্টা কাজ করানো হচ্ছে। ২৯টি শ্রম আইন বাতিল করে এই ৪টি কোড আনা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ১০০ দিনের কাজ (MNREGA) ধ্বংস ঃ গত ২১ ডিসেম্বর মোদী সরকার মনরেগা বা ১০০ দিনের কাজের আইন কার্যত বাতিল করে দিয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর নাম তারা আগেই সরাতে চেয়েছিল, কারণ নাথুরাম গডসে গান্ধীকে হত্যা করেছিল, আর এরা সেই গডসেরই পূজারী। এখন তারা বলছে খরচের ৪০% রাজ্য সরকারকে দিতে হবে। আপনারা জানেন রাজ্য সরকারের ভাঁড়ার শূন্য। রাজ্য দিতে পারবে না, কেন্দ্র কাজ কমিয়ে দেবে। এর ফলে গ্রামের গরিব খেতমজুররা কাজ পাবে না।

তৃতীয়ত, বিদ্যুতের বেসরকারীকরণ ও স্মার্ট মিটার ঃ আদানি-আম্বানিদের হাতে বিদ্যুৎ ক্ষেত্র তুলে দেওয়া হচ্ছে। প্রিপেইড স্মার্ট মিটার বসানো হচ্ছে। আমার নিজের বিল ৬০০ টাকা থেকে বেড়ে ২০০০ টাকা হয়েছে। মহারাষ্ট্রের এক গরিব আদিবাসী মহিলার বিল এসেছে ১ লক্ষ টাকা! এটা গরিব মানুষের ওপর ডাকাতি।

লেবার কোড দিয়ে শ্রমিকদের ওপর হামলা, মনরেগা বন্ধ করে খেতমজুরদের ওপর হামলা, আর স্মার্ট মিটার দিয়ে কৃষকদের ওপর হামলা। আর নিয়োগ বন্ধ করে মধ্যবিত্তের ওপর হামলা। লাভবান কারা? গৌতম আদানি, মুকেশ আম্বানি, জিন্দাল, টাটা—আর অবশ্যই আর এস এস।

তারা কীভাবে এটা সামলাচ্ছে?

মানুষ ক্ষুব্ধ। মানুষ লড়াই করছে। কিন্তু বিজেপি ও আর এস এস ব্রিটিশদের সেই পুরোনো নীতি ব্যবহার করছে—"ভাগ করো আর শাসন করো" (Divide and Rule)। ব্রিটিশরা যেমন হিন্দু-মুসলিম বিভাজন তৈরী করেছিল, আজ বিজেপি ঠিক সেটাই করছে। মুসলমানদের ওপর হামলা, খ্রিস্টানদের ওপর হামলা, দলিতদের ওপর হামলা—সবই এই বিভাজনের রাজনীতির অংশ।

কমরেড লেনিন বলেছিলেন, একজন ভালো বিপ্লবীর তিনটি গুণ থাকা চাই ঃ

১. তাকে হতে হবে একজন অগ্নিবর্ষী আন্দোলনকারী (Agitator)।

২. তাকে হতে হবে একজন ভালো প্রচারক ও শিক্ষক (Propagandist)---যিনি মানুষকে আমাদের মতাদর্শ বোঝাতে পারবেন।

৩. তাকে হতে হবে একজন নিপুণ সংগঠক (Organizer)।

আমাদের সবাইকে এই তিনটি গুণ অর্জন করতে হবে।

পরিশেষে, রাজনৈতিক বিকল্পের কথা বলে আমি শেষ করব। দয়া করে ভাববেন না যে বিজেপি-আর এস এস বা তৃণমূলের কোনো বিকল্প নেই। বিকল্প আছে এবং থাকবে। কয়েক মাস পরেই পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন। এখানে বামপন্থী বিকল্পকে শক্তিশালী করতে হবে। মানুষের কাছে যেতে হবে এবং বিজেপি ও তৃণমূল—উভয়ের দেউলিয়াপনা তুলে ধরতে হবে। নিউ ইয়র্কে জোহরান মামদানির জয়ের উদাহরণ মনে রাখবেন। ওটা ছিল জনগণের শক্তির জয়, সংগঠনের জয় এবং রাজনৈতিক চেতনার জয়।

প্রিয় সাথীরা, আসুন এই সম্মেলন থেকে আমরা শপথ নিই---আমরা আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করব। শ্রমিক, কৃষক, খেতমজুর, নারী, ছাত্র, যুব—সকলকে নিয়ে আমরা এক বিশাল ঐক্য গড়ে তুলব।

কার্ল মার্কসের সেই বিখ্যাত উক্তি দিয়ে আমি শেষ করব ঃ "দার্শনিকরা দুনিয়াকে কেবল বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু আসল কাজ হলো দুনিয়াটাকে বদলানো।"

আসুন, আমরা দুনিয়া বদলানোর লড়াইয়ে নামি। আসুন, ভারত বদলাই। আসুন, বাংলা বদলাই।

এই আশা ও বিশ্বাস নিয়ে আমি এই সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করছি। আপনারা সবাই ভালো থাকুন।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ! □

ইন্দ্রজিৎ রায় চৌধুরী

ত্রিপুরা কর্মচারী আন্দোলনের নেত্রীর বক্তব্য

গত ১০-১২ জানুয়ারী, ২০২৬ প্রণব চট্টোপাধ্যায় নগরের (কৃষ্ণনগর শহর) প্রশান্ত সাহা মঞ্চে অনুষ্ঠিত রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনে অন্যতম বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় সমিতি (এইচ বি রোড)-এর সাধারণ সম্পাদক মহুয়া রায়। তিনি এই সম্মেলনে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি (এইচ বি রোড)-এর পক্ষ থেকে জ্যেষ্ঠদের শ্রদ্ধা এবং উপস্থিত সবাইকে প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদেরকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য, আপনাদের অভিজ্ঞতা বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে এবং পশ্চিমবাংলা, ত্রিপুরার ক্ষেত্রে তো বটেই, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এই রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমাদের ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি (এইচ বি রোড)-এর অন্তর্ভুক্ত সমস্ত সংগঠনের সদস্যরা গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন, এই রাজ্য সম্মেলনে কী আলোচনা হচ্ছে, প্রতিনিধিদের আলোচনা, কী সিদ্ধান্ত হচ্ছে তা বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আপনারা ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছেন, আপনারা অনেকেই জানেনও, অনেকেই আমাকে বলেছেন আমাদের রাজ্যের যে গণ আন্দোলনের মুখপত্র 'ডেইলি দেশের কথা'-র মাধ্যমে ত্রিপুরার বর্তমান পরিস্থিতি আপনারা জানেন।

আমি সময়াভাবে খুব বেশি বলার সময় পাব না। আপনারা সকলেই জানেন কেন ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবাংলা আলাদা রাজ্য হলেও অনেক ক্ষেত্রেই আমরা মনে করি যে আমরা অভিন্ন। আমাদের রাজনীতি, আমাদের সামাজিক অবস্থা, সাংস্কৃতিক অবস্থা অনেকটাই অভিন্ন বলে মনে করি। আমার ব্যক্তিগতভাবে ১০ বছর আগে আপনাদের বহরমপুরের কাশিমবাজারে যে সম্মেলন হয়েছিল, সেখানে আসার সুযোগ হয়েছে। এছাড়া কেরালার যে সংগঠন, কেরালা এনজিও ইউনিয়ন, তাদের যে রাজ্য সম্মেলন, ৬০ বছর পূর্তি যখন হয় ২০২৩ সালে, সেখানে একটি সেশনের জন্য আমাদের সেখানে ইনভাইট করা হয়েছিল। সেই সম্মেলনে যাবার সুযোগ হয়েছিল। এখানে আপনারা প্রতিনিধি অধিবেশনে অ্যালাউ করেছেন আমাকে, কিন্তু কেরালার পদ্ধতি অনুসারে সেখানে প্রতিনিধি অধিবেশন শুধুমাত্র প্রতিনিধিদের নিয়েই হয়। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিনিধিদের আলোচনা শোনার সৌভাগ্য আমার হয়নি। যে সেশনে আমন্ত্রিত ছিলাম সেই সেশনেই আমাকে কথা বলতে হয়েছে।

আমাদের এখানে বসে আছেন স্মরজিৎ রায় চৌধুরী। তিনি দীর্ঘদিন ধরে আমাদের রাজ্যের সাথে জড়িত, সুকোমলদার সময় থেকে, অজয় মুখোপাধ্যায়দের সময় থেকে। সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠা লগ্ন এবং তারও আগে থেকে, আমাদের যে সাংগঠনিক বিস্তৃতি সেটা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা এর পাশাপাশি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতেও, বিশেষ করে ২০০৫ সাল থেকে, সুকোমল সেন, স্মরজিৎ রায় চৌধুরী, আর জি কার্নিক এনাদের নেতৃত্বে, এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে সংগঠিত করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা ত্রিপুরা, পশ্চিমবাংলা, কেরালা অত্যন্ত সংগঠিত রাজ্য ছিলাম।

আপনাদের আলোচনা শুনে, বিশেষ করে গতকাল থেকে যে আলোচনা শুনছি, সে আলোচনা শুনে যে উত্তাপ আমরা পাচ্ছি, যে আপনারা সবাই ভাবছেন এই পরিস্থিতি থেকে কীভাবে আমরা উত্তরণ পেতে পারি। আপনাদের মতো আমাদের রাজ্যেও ২০১৮ সালের পরে একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। আপনাদের সভাপতি আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন ত্রিপুরায় কী অবস্থা? সারা দেশের মতো ত্রিপুরাতেও এখন অঘোষিত জরুরি অবস্থা চলছে। জরুরি অবস্থার গল্প আমরা জানি। ১৯৭৫ সাল। ১৯৭১-এর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকার জন্য যে জনপ্রিয়তা ইন্দিরা গান্ধী অর্জন করেছিলেন, তারপরে যে ক্ষমতার একনায়কতন্ত্র স্বৈরাচারী ব্যবহার করেছেন এবং ফলশ্রুতিতে যে জরুরি অবস্থা, তার মূল্য দিতে হয়েছে তাঁকে ১৯৭৭ সালে। আজকেও ঘোষিত জরুরি অবস্থা না হলেও অঘোষিত জরুরি অবস্থা আমরা সারা দেশে দেখতে পাচ্ছি। ত্রিপুরায় ২০১৮ সালের পর থেকে, বিজেপি সরকার আসার পর থেকে যা ঘটেছে আপনারা জানেন অনেকটাই। তবুও আপনাদেরকে সতর্ক করার প্রয়োজন আছে। আপনাদের এখনও পেনশন আছে, পুরোনো পেনশন ব্যবস্থা আপনাদের আছে—ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র রাজ্য, আগামী দিনে সেটা নাও থাকতে পারে। আমাদের রাজ্যে ২০১৮ সালের জুলাই মাস থেকে সেটা চলে গেছে। এখন শুধু এনপিএস না, ইউপিএস-এর অপশনও সেখানে চলে এসেছে। অল্প সংখ্যায় নিয়োগ হলেও নতুন যে কর্মচারীরা নিয়োগ হচ্ছেন, তাঁদের জন্য এই খড়্গ সেখানে ঝুলছে, যেখানে পেনশনের কোনো নিশ্চয়তা নেই।

আমাদের রাজ্যে এসমা (ESMA) জারি হয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের বন্ধুরা এখানে আলোচনা করছিলেন। আমাদের রাজ্যে এই বিজেপি জোট সরকার আসার পর ফায়ার সার্ভিস কর্মচারীদের সংগঠন করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। নার্সিং কর্মচারীরা তাদের অসুবিধার কথা বলতে পারবেন না। গত ৮ বছর ধরে ডাক্তার নিয়োগ নেই, নার্সিং নিয়োগ নেই, সেখানে

মহুয়া রায়, সাধারণ সম্পাদক, ত্রিপুরা কর্মচারীর সমন্বয় সমিতি (এইচ বি রোড)

কর্মীস্বল্পতা, কাজ করতে হচ্ছে, কিন্তু তাঁরা কোনো আন্দোলন সংগ্রাম করতে পারবেন না, অঘোষিত জরুরি অবস্থার মধ্যে তাঁরা রয়েছেন, এসমা তাঁদের উপর প্রয়োগ করা হচ্ছে। আমরা এই অবস্থার মধ্যে সেখানে কাজ করার চেষ্টা করছি।

সম্প্রতি যেটা যুক্ত হয়েছে, সেটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। গতকালকেও ত্রিপুরা রাজ্যের ফটিকরায়ে সংখ্যালঘু অংশের উপর আক্রমণ করা হয়েছে, বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনারা শুনেছেন ত্রিপুরার কাঞ্চনপুরের ছেলে, মাত্র ২৩ বছর বয়স, এঞ্জেল চাকমা—সে দেরাদুনে পড়ত, সেখানে তার চেহারা দেখে নাকি তাকে মনে হয়েছে চীনা নাগরিক। তাকে মারধর করা হয় এবং ১০ দিন হাসপাতালে থেকে সে মৃত্যুবরণ করেছে। যখন তাকে মারধর করা হচ্ছিল, সে বলছিল আমি চীনা নই, আমি ভারতীয়, আমি ভারতীয় নাগরিক, আমি ইন্ডিয়ান, বারবার বলার চেষ্টা করছিল, তারপরও তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। ২৫ বছর ধরে রিকশা চালায় দিদার হোসেন, তাকে আগরতলা শহরের রাজপথে তার নাম জিজ্ঞেস করে তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে পিটিয়ে মারা হচ্ছে। এই নতুন করে একটা মৌলবাদ মাথাচাড়া দিচ্ছে। আমরা সাম্রাজ্যবাদ, মৌলবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে আজকে কিন্তু জড়িয়ে পড়ছি, এর বিরুদ্ধে লড়াই করা ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই। স্বাভাবিকভাবেই আমরা বলতে চাই যে আপনাদের লড়াই, আমাদের লড়াই অভিন্ন।

আপনারা জানেন ১৮ সালের পর ২৩ সালের নির্বাচনে যে পরিস্থিতি তৈরী হয়েছিল, সেখানে বিজেপি সরকারের যে কর্মকাণ্ড, জনগণের জন্য কোনো প্রতিশ্রুতি পূরণ তারা করছিল না। ফলশ্রুতিতে বিক্ষোভ ফেটে পড়ছিল। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা দেখলাম যে বিধানসভা নির্বাচনে যখন মানুষ তাদের বিরুদ্ধে রায় দেবেন, তখন তারা শিকারি মোরগের মতো। আমরা এটা বারে বারেই দেখেছি। কখনো ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি নামে, কখনো আইপিএফটি নামে, কখনো তিপ্রা মথার নামে, তারা সেখানে শিকারি মোরগের মতো স্লোগান দিয়েছেন, বিজেপি হটাও দেশ বাঁচাও। ৪২টা সীটে তারা তিপ্রা মথার আসন দিয়েছে। দিয়ে তারা এই বিজেপি বিরোধী স্লোগান দিয়ে সেখানে তারা ভোট দিয়েছে। বিজেপির ভোট কমেছে। মাত্র ৩১টা সিট ২৩-এর নির্বাচনে পেয়েছে। বিজেপি ক্ষমতায় আসতে পারত না যদি তিপ্রা মথা এই সহযোগিতা না করত। তারা মুখে বললেও তারা সেখানে খেলা খেলছে, গেম খেলছে। তারা সরকারের আজকে শরিক, তারপরও সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। এই যে অবস্থাটা, এটা আপনাদের আমরা জানাতে চাই, আপনাদের রাজ্যেও যাতে এরকম না ঘটে ২৬-এর নির্বাচনে। কেন-না আমরা সরকারী কর্মচারী হলেও আমরা একদিকে নাগরিক, একদিকে ভোট দিই, আরেকদিকে আমরা ভোট নিই, ভোটের কর্মী হিসেবে কাজ করি। এই দায়িত্ব আমাদের অবশ্যই নিতে হবে। আমাদের পরিবার যেভাবে ইনভল্‌ভ করছে আপনাদের রাজ্যে, এটা খুব শুভ লক্ষণ।

আমাদের রাজ্যে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন প্রজন্ম বাঁচাও আন্দোলন করছে। আন্তর্জাতিক করিডর, নেশার সাম্রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরা আজকে পরিচিত, ১ নম্বরে আছে। এইচ আই ভি পজিটিভের দিকে ত্রিপুরা ১ নম্বরে। ২০২৫ সালের যে পরিসংখ্যান, সেই পরিসংখ্যানে ১৬৯টা গণধর্ষণ হয়েছে। অর্থাৎ গড়ে মাসে ১৪টি করে গণধর্ষণ হচ্ছে আমাদের রাজ্যে। ৯টি করে খুন হচ্ছে প্রতি মাসে। এরকম একটা আইন-শৃঙ্খলাবিহীন অবস্থার মধ্যে আমরা রয়েছি। এই অবস্থার থেকে উত্তরণের জন্য সমস্ত অংশের মানুষ চেষ্টা করছে। পাহাড়ে আমাদের শক্তি কমে গিয়েছিল, এখন পাহাড়ে যে জায়গাগুলি থেকে মানুষরা ভুল বুঝে সরে গিয়েছিলেন, সেখানে নতুন করে আবার লাল ঝান্ডার মিছিল শুরু হচ্ছে। গণমুক্তি পরিষদ শক্তিশালী হচ্ছে, মানুষ এগিয়ে যাচ্ছেন। আমরা ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি (এইচ বি রোড)—গত ৮ বছরে আমাদের অনেক অফিস জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, দখল করা হয়েছে, সেখানে অনেক কর্মচারীদের পরিবারের উপর, জীবন-জীবিকার উপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে। নির্বাচনের পরে পরেই এরকম আক্রমণ ভাবাও যায় না। ত্রিপুরা রাজ্যে সংসদীয় প্রতিনিধি দল গিয়েছিলেন। আমরা তাঁদের হাতে এসব তুলে দিয়েছি।

এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা বলতে চাই যে, এই আক্রমণের বিরুদ্ধে গত ৮ বছর ধরে আমরা আমাদের রাজ্যের অনেক জায়গাতেই আমাদের সংগঠনের অফিস খুলতে পারছিলাম না। আমরা সংগঠনের সভা করতে পারছিলাম না। কিন্তু গত ২০২৪ সাল থেকে আমরা এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করছি একটু একটু করে। এখন আর হল সভা নয়, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা বাইরে বেরোব। সোশ্যাল মিডিয়ায় আগে আমরা মুখ দেখাতাম না। সেই জায়গায় সোশ্যাল মিডিয়ায় আমরা মুখ দেখানোর চেষ্টা করছি। একজন কমরেড গান গেয়ে গেছেন, তাঁকে সেখানে দূরবর্তী এলাকায় বদলি করে দেওয়া হয়েছে। গণসংগীত গেয়েছেন এই অপরাধে। একজন কমরেড ঝান্ডা ধরেছেন, সেখানে তাঁকে দূরবর্তী এলাকায় বদলি করে দেওয়া হয়েছে। আপনাদের রাজ্যে যে অবস্থা, সমস্ত নেতৃত্বদের বদলি করে দেওয়া হয়েছে, আমাদের রাজ্যেও একবার নয়, এই ৮ বছরে ৮ বারেরও বেশি বদলি হয়েছেন এরকম প্রচুর কমরেড সেখানে রয়েছেন। তারপরও আমরা চেষ্টা করছি আমাদের সংগঠনকে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে। গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে আমরা জেলা ভিত্তিক গণঅবস্থান করেছি ৩ ঘণ্টার—এটা আমরা গত ৮ বছরে ভাবতে পারিনি, যে বাইরে বেরিয়ে এসে গণঅবস্থান করব। আমাদের প্রতিটা জেলায় হয়েছে। কিন্তু আমরা যখন আগরতলা শহরে করতে গেছি, সেখানে প্রশাসন থেকে বাধা দেওয়া হয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসে একবার বাধা দেওয়া হয়েছে, নভেম্বর মাসে আরেকবার বাধা দেওয়া হয়েছে। কোনোভাবেই আমাদের কর্মসূচী করতে দেওয়া হচ্ছে না। এই প্রশাসনিক বাধাকে ডিভিয়েই আমরা রাস্তায়, রাস্তায় প্রোগ্রাম করছি। আজকেও আমাদের প্রোগ্রাম হচ্ছে। এই ১২ ফেব্রুয়ারী যে ধর্মঘট, সেই ধর্মঘট সারা দেশব্যাপী যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রামকে ত্রিপুরা রাজ্যে কীভাবে পালন করা যায়, তার মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নগুলির যে সভা, সেই সভায় ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি (এইচ বি রোড)-ও অংশ নিয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই, এই আন্দোলনের ময়দানে আমরা ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি (এইচ বি রোড) সেখানে অন্যান্য অংশের মানুষের সাথে, ছাত্রদের সাথে, যুব কর্মীদের সাথে, নারী কর্মীদের সাথে, সমস্ত অংশের মানুষের সাথে যৌথ আন্দোলনের মঞ্চেও আমরা সক্রিয়ভাবে রাস্তায় নামার চেষ্টা করছি। এভাবেই আমরা মনে করি, এই যে অশুভ শক্তি, যারা আমাদেরকে ভাগ করে দিতে চাইছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াইটা আমরা জোরদার করতে পারব এবং যদি আমাদের চেষ্টা থাকে, তাহলে পরে সেই যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করবই। কমরেড প্রণব চট্টোপাধ্যায়, কমরেড প্রশান্ত সাহা ও কমরেড সমীর ভট্টাচার্য—যাঁদের প্রতিকৃতি এখানে লাগানো হয়েছে, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং আবারও আপনাদের সবাইকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ! পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি জিন্দাবাদ! □

সুকান্ত চৌধুরী

শ্রমকোড—শ্রম দাসত্বের পরোয়ানা
প্রতিরোধে ১২ ফেব্রুয়ারীর ধর্মঘট

প্রণব কর

আপনি টয়লেটে গেলে আপনার কাজ চলে যেতে পারে—এভাবেই ধমকানো হচ্ছে মহিলা গিগ শ্রমিকদের। প্লাটফর্মগুলি গিগ কর্মীদের জিও লোকেশন প্রতিমুহূর্তে ট্র্যাক করছে, ফলে এক মিনিট সময়ও এদিক ওদিকে হলে অ্যালগরিদম পরিচালিত ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট গিগ কর্মীর আই.ডি. ব্লক হয়ে যাবে, তিনি কাজের কোনো অর্ডার পাবেন না। এই হচ্ছে শ্রমকোডের দ্বারা বাস্তবায়িত শ্রম-ব্যবস্থা, শ্রমিককে শ্রমদাসের পর্যায়ে নিয়ে যাবার জন্যই চালু হচ্ছে এই ব্যবস্থা।

২০১৯ এবং ২০২০ সালে ২৯টি শ্রম আইনকে বাতিল করে তৈরী হয়েছে শ্রমকোড। কোভিড পর্বে যখন কোটি কোটি শ্রমিক কারখানা বন্ধ হয়ে যাবার ফলে কর্মচ্যুত হয়ে দিশেহারা অবস্থায় রয়েছেন, ঠিক সেরকমই একটা সময়ে বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার লোকসভায় বিরোধী শূন্য অবস্থায় মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যে এই দানবীয় কোড পাশ করিয়ে নেন। ঠিক তার আগেই তিনটি কৃষি বিল পাশ করানোর প্রতিবাদে বিরোধী সদস্যরা ওয়াক আউট করেছিলেন, বলা হচ্ছে যে "Protected future ready workforce and resilient industries, boosting employment and driving labour reforms for Atmanirbhor Bharat"-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হলো এই শ্রমকোডের মাধ্যমে। আসলে কর্পোরেট সেক্টরকে অবাধ শ্রমিক শোষণের জন্য অস্ত্র তুলে দেওয়া হলো এই শ্রম কোডের মাধ্যমে।

১৯৯০-এর দশকে ভারতবর্ষে নব্য উদার অর্থনীতি চালু হবার মধ্য দিয়েই শ্রমিক কর্মচারীদের উপর আক্রমণ শুরু হয়। বাজপেয়ী সরকারের আমলে এই আক্রমণ আরও তীব্র হয়। VRS, Retrenchment, পেনশন বেসরকারিকরণ ইত্যাদি কাজগুলি বাজপেয়ীর আমলেই দ্রুততর হয়। আর ২০১৪ সালে মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার আসীন হতেই এই আক্রমণ আরও হিংস্র রূপ ধারণ করেছে শ্রমকোডের মধ্য দিয়ে।

কোড অন ওয়েজেস (Code On Wages) ঃ এই কোডটি চারটি প্রচলিত আইনকে বাতিল করে তৈরী হয়েছে। এই চারটি আইন হলো—(i) মিনিমাম ওয়েজ অ্যাক্ট, ১৯৪৮, (ii) পেমেন্ট অব বোনাস অ্যাক্ট, ১৯৬৫, (iii) ইক্যুয়াল রেমুনারেশন অ্যাক্ট, ১৯৭৬ এবং (iv) পেমেন্ট অব ওয়েজেস অ্যাক্ট, ১৯৩৬।

এই কোডটিতে দাবি করা হয়েছে যে সংগঠিত এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের সমস্ত কর্মচারী এবং শ্রমিকদেরই এই কোডের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু কোডটির 2(z)(d) ধারাতে স্পষ্ট করে বলা আছে যে সুপারভাইজারি পদে কর্মরত কোনো ব্যক্তির বেতন ১৫,০০০ টাকার বেশি হলে তিনি আর শ্রমিকের সংজ্ঞার আওতাভুক্ত হবেন না। ফলে তিনি আর কোড অন ওয়েজেস-এর অন্তর্ভুক্তই হবেন না। প্রচলিত শ্রম আইনগুলির অধীনেই ৯০ শতাংশ শ্রমজীবী মানুষ পড়েন না। কোডগুলিতে অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য কারখানাগুলির শ্রমিকের ন্যূনতম সংখ্যা আরও বাড়ানো হয়েছে। ফলে কোডগুলির আওতায় আরও কমসংখ্যক শ্রমিক, কর্মচারীরা অন্তর্ভুক্ত হবেন।

এখন এই কোডে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের কথা। এই মজুরি নির্ধারণের জন্য শ্রমিকদের দক্ষতা, কাজের ধরন, ভৌগোলিক অবস্থান, পরিবেশ ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে সরকার বিভিন্ন কমিটি গঠন করবেন বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (ধারা-6), কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে এই ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত হবে সে সম্পর্কে কিছুই বলা নেই। সাধারণত একটি শ্রমজীবী পরিবারের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও অন্যান্য কথা বলে দেওয়া হয়। কিন্তু সেসব কিছুই ওয়েজ কোডে নির্ধারণ করা হয়নি।

ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বর্তমানে ১৯৯১ সালের সুপ্রিম কোর্টের রেপ্টাকোস রায়ে বেঁধে দেওয়া ছয়টি বিষয়কে হিসেবের মধ্যে রাখা হয়। সেগুলি হলো—(১) একজন উপার্জনশীল ব্যক্তির পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৩ বলে ধরা হবে, (২) প্রতি সদস্যের দৈনিক ক্যালোরি ইনটেক ২৭০০ ক্যালোরি, (৩) বছরে ১৮ গজ করে মোট ৭২ গজ বস্ত্রের সংস্থান, (৪) বাসস্থানের সংস্থান, (৫) জ্বালানি, আলো এবং আরও বিবিধ উপাদানের জন্য মোট মজুরির ২০ শতাংশ ধার্য করা এবং (৬) সন্তানদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন, উৎসব ইত্যাদির জন্য মোট মজুরির আরও ২৫ শতাংশ।

কিন্তু নতুন ওয়েজ কোডে এ জাতীয় কোনো ব্যবস্থাই রাখা হয়নি। ফলে আগামী দিনে ন্যূনতম মজুরি কোনো বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার উপর দাঁড়িয়ে তৈরী করার সম্ভাবনা নষ্ট করা হচ্ছে এই কোডে।

কোড অন ওয়েজেস-এর ৯নং ধারায় বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশের জন্য একটি 'ফ্লোর ওয়েজ' (Floor Wage) তৈরী করবে। কোড অন ওয়েজেস ২০১৯ সালে লোকসভায় পাশ করানোর ঠিক আগে ১৭৮ টাকা ফ্লোর ওয়েজের ঘোষণা করা হয়, তার পরবর্তীতে ফ্লোর ওয়েজের আর কোনও বৃদ্ধি ঘটেনি।

১৯৪৮ সালে গঠিত ত্রিপাক্ষিক কমিটিতে তিন ধরনের মজুরির কথা বলা হয়েছিল—সর্বনিম্নে আছে মিনিমাম ওয়েজ, সর্বাগ্রে লিভিং ওয়েজ এবং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী স্তরে ফেয়ার ওয়েজ। আমাদের সংবিধানের ৪৩নং ধারায় লিভিং ওয়েজের সংজ্ঞা দেওয়া আছে—The State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organisation or any other way to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work, a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities.

এতদিন পর্যন্ত লক্ষ্য ছিল শ্রমজীবীদের মজুরি মিনিমাম ওয়েজ থেকে বৃদ্ধি করে লিভিং ওয়েজের দিকে নিয়ে যাওয়ার। কিন্তু ওয়েজ কোড ফ্লোর ওয়েজ-এর মধ্য দিয়ে মিনিমাম ওয়েজের থেকে অনেক কম একটি মজুরি ঘোষণা করে ন্যূনতম মজুরি থেকে কম মজুরিতে শ্রমজীবীদের কাজ করতে বাধ্য করবে আগামী দিনে।

আসলে শ্রমিকের মজুরি এবং শিল্পপতির লভ্যাংশের মধ্যে দ্বন্দ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান দ্বন্দ্ব। এই শ্রমকোড শ্রমিকের মজুরি কমিয়ে মালিকের লভ্যাংশ বাড়ানোর কাজেই প্রযুক্ত হচ্ছে।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন কোড (Industrial Relation Code) ঃ ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট, ১৯২৬; ইন্ডাস্ট্রিয়াল এমপ্লয়মেন্ট (স্ট্যান্ডিং অর্ডারস) অ্যাক্ট, ১৯৪৬ এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট অ্যাক্ট, ১৯৪৭—এই তিনটি আইনকে বাতিল করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন কোড চালু করা হচ্ছে।

ভারতীয় সংবিধানের ১৯নং ধারায় বলা আছে শ্রমিকরা মালিকের সঙ্গে দর কষাকষির জন্য ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করতে পারবে। ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট, ১৯২৬-এর 4(1) ধারা অনুযায়ী অন্ততপক্ষে ৭জন শ্রমিক মিলে একটি কারখানায় একটি ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করতে পারবে। কিন্তু ২০০১ সালে এই ধারাটি সংশোধন করে বলা হয় যে অন্ততপক্ষে ১০ শতাংশ শ্রমিক বা ১০০ জন শ্রমিক—এদের মধ্যে যেটি কম, তাদের দ্বারা একটি ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করা যাবে। এই সংশোধনীটিকে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন তীব্রভাবে সমালোচনা করে এই সংশোধনী বাতিল করতে নির্দেশ দেয়। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন (আই. আর.) কোডের 6(2) এবং 6(4) ধারার মধ্য দিয়ে এই সংশোধনীই বজায় রাখা হয়েছে। ফলে বর্তমান কোড অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করাই একটি দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

আবার রেজিস্ট্রার যদি কোনো খবর পান যে কোনো ট্রেড ইউনিয়ন কোড ভঙ্গ করে কোনও কাজ করেছে তবে তিনি তার ভিত্তিতেই ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন বাতিল করে দিতে পারবেন। আই. আর. কোডের মধ্যে ধর্মঘট সংক্রান্ত বিধিগুলিও অন্তর্ভুক্ত থাকায়, ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রারের হাতে বিপুল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ছে। ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট অনুযায়ী কোনো একটি নথীভুক্ত ইউনিয়নের পদাধিকারী বা সদস্য ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত কোনো কর্মসূচী পালন করলে আইনের 120B(2) ধারা অনুযায়ী প্রশাসন তার বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা করতে পারবে না। কিন্তু বর্তমানে ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা বেশ সহজ হয়ে যাওয়ায় এই রক্ষাকবচ নষ্ট করা সহজ হয়ে গেছে। আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি পোস্টাল দপ্তরের ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়েছে কৃষক আন্দোলনে অর্থ সাহায্য করার জন্য।

ধর্মঘটের অধিকার ঃ শিল্প বিরোধ আইনের বিরোধিতা করে বাবা সাহেব আম্বেদকর ১৯৩৮ সালে বলেছিলেন যে স্বাধীনতার অধিকারের অপর নামই হল ধর্মঘটের অধিকার। একজন শ্রমজীবী মানুষ তাঁর শ্রম কী শর্তে বিক্রি করবেন তা ঠিক করার স্বাধীনতা নির্ধারিত হয় ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে। সুতরাং স্বাধীনতার অধিকার মানে ধর্মঘটেরও অধিকার। কিন্তু আই. আর. কোডে ধর্মঘটের অধিকার প্রায় নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। এই অধিকার দু'দিক থেকে আক্রান্ত হচ্ছে। পদ্ধতিগত জটিলতার মধ্য দিয়ে ধর্মঘট করা দুরূহ করে তোলা হচ্ছে, আবার তারও পরে ধর্মঘট করলে জেল-জরিমানা সবকিছুরই ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

আই. আর. কোডের মধ্যে ধর্মঘট করার ৬০ থেকে ১৪ দিন আগে ধর্মঘটের নোটিশ দিতে হবে। নোটিশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আলোচনার প্রক্রিয়া (Conciliation Process) শুরু হয়ে যাচ্ছে বলে ধরে নেওয়া হবে। আলোচনা আদপে না হলেও আলোচনা হচ্ছে বলে ধরা হবে। আলোচনা প্রক্রিয়া চলাকালীন ধর্মঘটে অংশ নেওয়া চলবে না। আলোচনা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার আগে ধর্মঘট ডাকলে তা বেআইনি ধর্মঘট হবে। আলোচনা প্রক্রিয়া শেষ হবার ৭ দিনের মধ্যে কোনও ধর্মঘট ডাকা যাবে না। ধর্মঘটের বিষয় নিয়ে কোনো কোর্টে মামলা চললে, সেই মামলার রায়দানের পরে ৬০ দিনের মধ্যে কোনও ধর্মঘট করা যাবে না। I L O-এর মতে আইনসম্মত ধর্মঘট পালনের জন্য যেসব শর্তপূরণ করতে হবে সেগুলি যেন যুক্তিসম্মত ও সহজ সরল হয়। এমন কোনো শর্ত আরোপ করা যাবে না যা ধর্মঘটের অধিকারের উপর বাধা সৃষ্টি করতে পারে। I L O-এর নীতি অনুসারে যারা আপৎকালীন পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত এবং সরকারী আমলারাই শুধু ধর্মঘট করতে পারবে না। কিন্তু শ্রমকোডের মধ্য দিয়ে ধর্মঘটে যেসব শর্ত আরোপ করা হয়েছে তাতে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের পক্ষেই ধর্মঘট করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

১৯৪৭ সালের শিল্প বিরোধ আইনে বলা ছিল যে পরিবহন, বিদ্যুৎ, জল সরবরাহ, ডাক ব্যবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন জন পরিষেবামূলক ক্ষেত্রগুলিতেই ধর্মঘটের আগে নোটিশ দিয়ে কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে, অন্য কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে এরকম কোনো নোটিশ দেবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু বর্তমান ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন কোডের ৬২নং ধারা অনুযায়ী সব শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদেরই ধর্মঘটে যাবার আগে কর্তৃপক্ষকে নোটিশ দিয়ে জানাতে হবে। ফলে শ্রমজীবীদের পক্ষে আইনসঙ্গত ভাবে ধর্মঘট করা কঠিন হয়ে পড়বে।

আবার শ্রমজীবীরা যদি বেআইনি ধর্মঘটকে সমর্থন করেন তাহলে তাদের উপর আই. আর. কোডের ৮৬(১৩), ৮৬(১৫) এবং ৮৬(১৬) নং ধারা অনুযায়ী কঠোর শাস্তি আরোপ করা হয়েছে।

৮৬(১৩) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি কেউ অবৈধ ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে তবে তাকে ১০০০ থেকে ১০০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা এক মাসের জেল বা দুটি শাস্তিই দেওয়া হতে পারে।

৮৬(১৫) নং ধারায় বলা হয়েছে যে কেউ যদি অন্য কাউকে ধর্মঘটে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করে তবে তাকে ১০০০০ থেকে ৫০০০০ টাকার জরিমানা অথবা এক মাসের জেল বা একসঙ্গে দুটি শাস্তিই দেওয়া হতে পারে। ধর্মঘট সফল করতে কেউ যদি কোনো অর্থ সাহায্য করে তবে ৮৬(১৬) নং ধারা অনুযায়ী তার উপরেও একই শাস্তির খাঁড়া নেবে আসবে।

আবার ৯৩(১) এবং ৯৩(২) ধারায় বলা হয়েছে যে কোনো শ্রমিক যদি ধর্মঘট ভঙ্গ করে কাজে যোগদান করেন তবে ট্রেড ইউনিয়ন তার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে না।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে শ্রমিক আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ধর্মঘটের অধিকারকে বিনষ্ট করতে শ্রম কোড বেপরোয়া আক্রমণ নামিয়ে এনেছে।

ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতি ঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন কোডের ১৪নং ধারায় ট্রেড ইউনিয়নগুলির গঠন ও স্বীকৃতির সংজ্ঞা দেওয়া আছে।

এতে বলা হয়েছে যে কোনো একটি শিল্প সংস্থায় একটি ইউনিয়ন সংস্থার মাস্টার রোলে (muster roll)-এ থাকা শ্রমিকদের ৫১ শতাংশ বা তার বেশি শ্রমিকের সমর্থন পেলে একমাত্র সেই ট্রেড ইউনিয়নকে মালিকপক্ষ তাদের সঙ্গে নির্ধারিত বিষয়ে আলাপ আলোচনার জন্য স্বীকৃতি দেবে। যদি কোনও ট্রেড ইউনিয়নের ৫১ শতাংশ শ্রমিকদের সমর্থন না থাকে তবে সেই সংস্থার যেসব ট্রেড ইউনিয়ন অন্তত ২০ শতাংশ শ্রমিকদের সমর্থন পাবে তাদের নিয়ে মালিকপক্ষ একটি নেগোশিয়েটিং কাউন্সিল তৈরী করবে।

এই সংজ্ঞার মধ্য দিয়ে এমন কিছু বিপজ্জনক ধারণার জন্ম দেওয়া হয়েছে যাতে করে আগামীদিনে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করাই অসম্ভব হয়ে যাবে।

প্রথমত বলা হয়েছে, ট্রেড ইউনিয়নগুলি কর্তৃপক্ষ/মালিকপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়গুলি নিয়েই শুধুমাত্র আলোচনা করতে পারবে, শ্রমিকদের মধ্যে থেকে উঠে আসা দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে আলোচনা হবে না। দ্বিতীয়ত, ট্রেড ইউনিয়নগুলির স্বীকৃতি দেবে মালিকপক্ষ, কোনো আইনস্বীকৃত সংস্থা নয়। এর ফলে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে মালিকপক্ষের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ার ব্যবস্থা তৈরী করা হচ্ছে। তৃতীয়ত, সংস্থার মাস্টার রোলে থাকা কর্মচারী বা শ্রমিকরাই ভোটার হিসেবে স্বীকৃত হবেন। ফলে বিশাল সংখ্যক চুক্তিবদ্ধ,

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

পঞ্চম পৃষ্ঠার পরে

শ্রমকোড—শ্রম দাসত্বের পরোয়ানা প্রতিরোধে ১২ ফেব্রুয়ারীর ধর্মঘট

অস্থায়ী শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে কোনো ভূমিকা নিতে পারবেন না। চতুর্থত ভোটদানের ক্ষেত্রে 'সিক্রেট ব্যালট' প্রয়োগের কোনো ব্যবস্থা থাকছে না। পঞ্চমত, মালিকপক্ষ সমর্থিত একটিমাত্র ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতির ব্যবস্থা এক ধরনের শ্রমিক সিন্ডিকেট গড়ে তোলার পথকে সুগম করে তুলবে। তাই অবিলম্বে এইসব নিয়ামবলীর পরিবর্তন দরকার।

সোসাল সিকিউরিটি কোড ঃ নয়টি প্রচলিত আইনকে বাতিল করছে এই কোড। সরকারী প্রচারে বড় বড় দাবি করা হচ্ছে যে সমস্ত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার মধ্যে নিয়ে আসা হচ্ছে। আসলে ঘটছে তার বিপ্রতীপ ঘটনা। ই পি এফ-এর ক্ষেত্রে ন্যূনতম ২০ জন শ্রমিক এবং ই এস আই ও গ্র্যাচুইটির ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১০ জন শ্রমিক নিযুক্ত থাকার যে শর্তাবলী ছিল তার কোনো পরিবর্তন হয়নি। পাশাপাশি কোনও শ্রমিকের মজুরি ১৫,০০০ টাকার বেশি হলে তিনি এই সমস্ত সুবিধা পাবার অধিকার হারাবেন।

নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সংস্থায় ১০ জনের কম শ্রমিক থাকলে সামাজিক সুরক্ষা বিধির আওতায় পড়বেন না। সংস্থায় ৫০ লক্ষ টাকার নীচে কাজ হলে সেখানকার শ্রমিকরাও সামাজিক সুরক্ষা বিধির আওতায় থাকবেন না।

পরিযায়ী শ্রমিকদের আয় যদি ১৮ হাজার টাকার বেশি হয় তবে তাঁরাও আর এই সুরক্ষা বিধির আওতায় থাকবেন না। গিগ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে জীবনের সুরক্ষা, দুর্ঘটনার হাত থেকে সুরক্ষা, স্বাস্থ্য এবং মাতৃত্বকালীন সুবিধা, ক্রেশের সুবিধা ইত্যাদি গালভরা অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সমস্ত দায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এগ্রিগেটরদের উপর। এগ্রিগেটররা তাদের লেনদেনের ১ থেকে ২ শতাংশ খরচ করবেন গিগ শ্রমিকদের সুরক্ষায়। কিন্তু এই সুরক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্গত হতে গেলে গিগ শ্রমিকদের বছরে অন্ততপক্ষে ৯০-১২০ দিন কাজে নিযুক্ত থাকতে হবে। এর ফলে গিগ শ্রমিকদের একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশই এই সুরক্ষা ব্যবস্থার অধীনে আসার সুযোগ পাবেন। গিগ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে সব থেকে বড় অসুবিধা হলো তাঁদের নিয়োগকর্তার কোনো সংজ্ঞা না থাকা, ফলে তাঁরা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলে কাদের কাছে অভিযোগ জানাবেন তাই ঠিক হয়নি।

এই সবের বিরুদ্ধে ২০২৫-এর ২৫ ডিসেম্বর গিগ শ্রমিকরা একটি সাড়া জাগানো ধর্মঘট করে। ফলে ১০ মিনিটের মধ্যে ডেলিভারি দেবার অমানুষিক প্রথার পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু এখনও অসংখ্য সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন তাঁরা। নীতি আয়োগ সম্প্রতি বলেছে যে ২০৩০ সালের মধ্যে এই ক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যা ২.৩৫ কোটি হবে। কিন্তু অ্যালগরিদমের বিষাক্ত চক্রে পড়ে গিগ শ্রমিকরা প্রায় ক্রীতদাসে পরিণত হয়ে যাচ্ছেন, সব থেকে মারাত্মক সমস্যা তাঁদের আইডি ব্লক করে দিয়ে কাজ বন্ধ করে দেওয়া। গিগ শ্রমিকদের প্ল্যাটফর্ম পার্টনার বলে তাঁদের নানা সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এ সমস্ত কিছুর কোনো প্রতিফলন শ্রমকোডে দেখা যাচ্ছে না।

অকুপেশনাল সেফটি, হেলথ এন্ড ওয়ার্কিং কন্ডিশন কোড ঃ ১৩টি প্রচলিত আইনকে বাতিল করছে এই কোড। ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট, ১৯৪৮-এ সাপ্তাহিক কাজের ঘণ্টা, প্রতিদিনের কাজ কতক্ষণ বিশ্রাম পাওয়া যাবে, একটি নির্দিষ্ট দিনে সর্বোচ্চ কতক্ষণ কাজ করানো যেতে পারে (spread over), ওভারটাইম, সাপ্তাহিক ছুটি—সবকিছু নির্দিষ্ট করে বলা ছিল। কিন্তু বর্তমান শ্রমকোডে এগুলির কোনোটিই নির্দিষ্ট নেই। ফ্যাক্টরি অ্যাক্টে বলা ছিল সপ্তাহে সর্বোচ্চ ৪৮ ঘণ্টা কাজ করানো যাবে। বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে দৈনিক ১২ ঘণ্টা কাজ করানোর রীতি চালু হয়ে গেছে। শিল্পপতিরা নিদান দিচ্ছেন, বাড়িতে বসে পরিবারের দিকে তাকিয়ে থেকে সময় নষ্ট করবেন না, সপ্তাহে অন্তত ৯০ ঘণ্টা কাজ করুন। ফলে এটিই সাপ্তাহিক কাজের সময়ে পরিণত হচ্ছে।

ফ্যাক্টরিগুলিতে শ্রমিক আইন মানা হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য ইন্সপেক্টর পদ তৈরী করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সেই পদটিকে 'ইন্সপেক্টর- কাম-ফেসিলিটেটর' পদে পরিবর্তিত করা হয়েছে। তদন্ত বন্ধ, মালিকপক্ষকে সুবিধা প্রদানে ব্যস্ত।

ইন্সপেক্টররা ফ্যাক্টরি আইন, ১৯৪৮ অনুসারে বিনা নোটিশে ফ্যাক্টরি পরিদর্শনে যেতে পারতেন। মালিকপক্ষ আইন ভঙ্গ করলে তাদের দু'বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড দেওয়া যেত। কিন্তু বর্তমান সরকার নির্দেশিত পদ্ধতিতেই ইন্সপেক্টরদের কারখানা পরিদর্শনে যেতে হবে, শ্রমিকদের অভিযোগের ভিত্তিতে কোনো বিনা নোটিশের তদন্ত নয়। কোনও সারপ্রাইজ ভিজিটও করা যাবে না। অ্যালগরিদম পরিচালিত কিছু এলোমেলো পরিদর্শন করবেন তাঁরা। মালিকপক্ষকে ইন্সপেক্টরদের কোনও সহযোগিতা করার দায় থাকবে না।

১৯৮৪ সালের ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা দেখিয়ে দিয়েছে যে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়ে কতটা অবহেলা চলে। অতি সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগণার নাজিরাবাদ কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ৩১ জন শ্রমিকের মৃত্যু, রানিগঞ্জ কয়লাখনিতে শ্রমিকদের মৃত্যু চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে যে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা কোন তলানিতে গিয়ে পৌঁছেছে। বর্তমান শ্রমকোড এই ব্যবস্থাকেই শিল্পের প্রসারের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা বলে ঘোষণা করছে।

শ্রমকোডের এই ভয়াবহ আইনগুলি আমাদের ক্ষেত্রে সার্ভিস রুলগুলিকে প্রভাবিত ও পরিবর্তন করবে। ইতিমধ্যেই আমাদের যে ষষ্ঠ পে-কমিশন তৈরী হয়েছে তাতে ন্যূনতম মজুরির প্রয়োগ বাতিল করা হয়েছে, মহার্ঘভাতা দয়ার দানে পরিবর্তিত হয়েছে। আক্রমণ নামতে চলেছে আমাদের পেনশন ব্যবস্থায়। এরকম চিন্তাভাবনা চলছে যে অবসরগ্রহণের পর নির্দিষ্ট কিছু বছরের জন্যই পেনশন চালু থাকবে, তারপর তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে চেষ্টা চলছে পেনশন রিভিশন ব্যবস্থা বাতিল করে দেওয়ার। ফলে শ্রমকোড লাগু হওয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের চাকরির শর্তাবলীতে কোনও ক্ষতি হবে না এরকম আত্মঘাতী চিন্তা থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। আগামীদিনে শ্রমকোড বাতিলের দাবিতে সমগ্র শ্রমজীবী মানুষ যে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে সেই সংগ্রামে আমাদেরও শামিল হতে হবে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই। কৃষকেরা যেভাবে তিনটি কৃষি আইনকে বাতিল করেছিল, সেভাবেই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এই শ্রমকোডকে বাতিল করতে হবে। গত ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬-এর ধর্মঘটে শ্রমজীবীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ এই লড়াইয়ের সূচনা করেছে।

মূলত শ্রমকোড লাগু করার বিরোধিতা করেই গত ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখে সারা ভারত জুড়ে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয় সি আই টি ইউ সহ কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি এবং কর্মচারী ফেডারেশনগুলি। একই সঙ্গে অত্যন্ত লজ্জাজনক শর্তে ভারত আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করায় কৃষক এবং খেতমজুররাও এই ধর্মঘটে পূর্ণশক্তি নিয়ে অংশগ্রহণ করেছিল। এর মধ্য দিয়ে ১২ ফেব্রুয়ারীর ধর্মঘট ভারতবর্ষের অন্যতম সফল ধর্মঘটে পরিণত হয়েছে।

২০০০টির বেশি স্থানে হাজার হাজার শ্রমিক-কৃষক- খেতমজুররা সারাদিন ধরে অবস্থান, মিছিল করেছে। কয়লা উত্তোলন এবং পরিবহন শিল্পে প্রায় ৯০ শতাংশ শ্রমিক যোগদান করেছেন ধর্মঘটে। বিদ্যুৎ শিল্পে এসমা জারি থাকলেও ধর্মঘটের গুরুতর প্রভাব পড়েছে। গ্যাস, পেট্রোলিয়াম এবং পরিশোধন ক্ষেত্রের চুক্তির কর্মীরা আসামে সম্পূর্ণ ধর্মঘট করেছে। সারা দেশ জুড়ে এল. পি. জি. বটলিং প্ল্যান্টের কাজ ধাক্কা খেয়েছে বিশালভাবে। দেশের সমস্ত বন্দরগুলিতে ডক শ্রমিক, কার্গো শ্রমিক এবং চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকরা বিপুলভাবে অংশগ্রহণ করেছে ধর্মঘটে। পাঞ্জাব এবং উড়িষ্যায় সড়ক পরিবহন শিল্পে ধর্মঘটের ধাক্কা পড়েছে বিপুলভাবে। পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া, হুগলী, দুর্গাপুর এবং হলদিয়াতে পণ্য পরিবহন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রেলের চুক্তিবদ্ধ কর্মচারীরা সেকেন্দ্রাবাদ, চেন্নাই, নাগপুর, ভুবনেশ্বর, পাটনা এবং কলকাতা ডিভিশনে গেটে অবস্থান বিক্ষোভ এবং সভা করেছে।

উৎপাদন শিল্পে ধর্মঘটের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। ইঞ্জিনীয়ারিং, অটোমোবাইল, বস্ত্র, পাট, চা, কফি, রাসায়নিক এবং ঔষধ শিল্পে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। কোচিনের SEZ অঞ্চলে প্রায় ৪০,০০০ শ্রমিক ধর্মঘটে যুক্ত হয়েছেন। স্যান্ডভিক, তোশিবা, মহিন্দ্রা এন্ড মহিন্দ্রার মতো বহুজাতিক সংস্থাগুলিতেও সফলভাবে ধর্মঘট হয়েছে।

ব্যাঙ্ক, বীমা ও অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত আর্থিক সংস্থায়ও ধর্মঘটের বিপুল প্রভাব পড়েছে। কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, পাঞ্জাব এবং পশ্চিমবঙ্গে অঙ্গনওয়াড়ি, আশা, মিড-ডে মিলের কর্মীরা প্রায় সর্বাঙ্গীন ধর্মঘট করেছেন। নির্মাণ শিল্প, গৃহ সহায়িকা এবং গিগ কর্মীরা বিপুলভাবে পিকেটিং এবং ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছেন।

এই ধর্মঘট বুঝিয়ে দিয়েছে যে শ্রমজীবী মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করেই শ্রম দাসত্বের এই পরোয়ানাকে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দেবে আগামী দিনে। □

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

কর্পোরেট-হিন্দুত্বের আঁতাতের বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলুন

মহুয়া রায় ত্রিপুরায় বিজেপি সরকারের দ্বারা কর্মচারীদের উপর আক্রমণের বিবরণ তুলে ধরেন এবং পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকারের সাথে তুলনা করে বলেন ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের শাসকের আক্রমণ একই ধরনের। এর বিরুদ্ধে উভয় রাজ্যের শ্রমিক কর্মচারীরা লড়াই করছেন।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে প্রতিনিধিদের আলোচনাই মূলত আগামীদিনের আন্দোলনের দিক নির্দেশ করে। আলোচকদের মধ্যে ৩ জন (১ জন মহিলা সহ) চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী বক্তব্য রাখেন। ওইদিন নদীয়া জেলার কর্মচারীদের পরিবার-পরিজনরা সমস্ত প্রতিনিধিদের সম্বর্ধনা জানান এবং দুপুরের আহার তাঁরাই বিতরণ করেন। সম্মেলন মঞ্চে নদীয়ার ১০ বছরের রোহন চক্রবর্তী তার টিফিনের পয়সা জমিয়ে সম্মেলন তহবিলে ১৬৪২ টাকা দান করেছে। সম্মেলন মঞ্চ থেকে ছোট্ট রোহনকে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে। ওইদিন সম্মেলনের পর্যবেক্ষণমূলক বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রবীণ নেতৃত্ব প্রবীর মুখার্জী। তিনি বলেন, আমরা সুরক্ষা বলয়ে থাকছি না তো? সম্মেলনে আমরা কি সমালোচনা-আত্মসমালোচনা করছি? আমাদের আদর্শবোধ আক্রান্ত, তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। সম্মেলনের দিনগুলিতে প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানিয়ে বিভিন্ন সময়ে গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় ও জেলার সাংস্কৃতিক টিম। এছাড়াও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলের পক্ষ থেকে মনোগ্রাহী নাটক উপস্থাপন করা হয়েছে।

তৃতীয় দিনে প্রতিনিধিদের আলোচনার শেষে অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক কাজল সরকার গত ৬ মে, ২০২৫ অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের পর থেকে রাজ্য সম্মেলন সফল করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচীর সাফল্যকে তুলে ধরেন। ক্রেডেনশিয়াল কমিটির রিপোর্ট পেশ করেন সংগঠনের মুখপত্র 'সংগ্রামী হাতিয়ার' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক সুমন কান্তি নাগ। পরবর্তীতে সংগ্রামী হাতিয়ারের বিশেষ সংখ্যা (প্রচ্ছদ প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন পিনাকী চক্রবর্তী, এস ই এস এ-র সদস্য, হুগলী জেলা) প্রকাশ করেন বিশেষ অতিথি সি আই টি ইউ-র নেতৃত্ব আভাস রায়চৌধুরী। তিনি বলেন, প্রশাসনে কর্মচারী কমছে, সেই অনুযায়ী নিয়োগ হচ্ছে না। সীমিত সংখ্যক কর্মচারীদের নিয়ে প্রশাসন চলছে। চুক্তির কর্মচারীদের উপর চাপ বাড়ছে। SIR নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে। আন্দোলন করলে আক্রমণ করা হচ্ছে। মালিক স্বার্থে শ্রম আইন আনা হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার একই পথের পথিক। নিজেদের শক্তি বাড়াতে হবে। বাম বিকল্প তুলে ধরতে হবে। এরপর আয়-ব্যয়ের উপর জবাবী ভাষণ দেন কোষাধ্যক্ষ লিটন পান্ডে।

৬৫ জন প্রতিনিধির আলোচনার পর জবাবী ভাষণ পেশ করেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। তিনি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম আন্দোলনকে আরো তীব্র করতে সংগঠনকে সর্বস্তরে আরো সক্রিয় করে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সম্মেলনে সমগ্র ডক্যুমেন্টস সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সম্মেলন মঞ্চ থেকে ১০৪ জন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও সভাপতি মানস দাস, সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত রায়, সহ সম্পাদকদ্বয় প্রণব কর ও শাশ্বতী মজুমদার, দপ্তর সম্পাদক বাপ্পা দাস এবং কোষাধ্যক্ষ প্রশান্ত চন্দ সহ ৩০ জনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীকে নির্বাচিত করা হয়। পাশাপাশি রাজ্যের চুক্তিবদ্ধ কর্মচারীদের জন্য নতুন সংগঠন গঠন করা হয় এবং তার জন্য একটি অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি মানস দাসের সমাপ্তি ভাষণ ও আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে। পরবর্তীতে কৃষ্ণনগরের কারবালা ময়দানে প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পুনর্নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, সি আই টি ইউ নেতা আভাস রায়চৌধুরী এবং মহিলা আন্দোলনের নেত্রী দেবলীনা হেমব্রম। সমাবেশ পরিচালনা করেন পুনর্নির্বাচিত সভাপতি মানস দাস। □

বিদ্যুত দাস

কমরেড অভিজিৎ দাস নামাঙ্কিত প্রগতিশীল পুস্তক বিপণন কেন্দ্র উদ্বোধন

মানুষের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু হচ্ছে বই। বই শুধু বন্ধু নয়, বই আমাদের অন্যতম পথপ্রদর্শক। বই মানষ্যের মনের চোখ খুলে দেয়, যাকে বলা হয় মনশ্চক্ষু। আমাদের

অলোকেশ দাস

ভাবনা, আমাদের চিন্তা, আমাদের সৃজনীশক্তি, আমাদের সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা, এগুলো আমাদের বই-ই দেয়। যে দর্শনের উপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি, বস্তু থেকে চিন্তার এই অমোঘ ব্যবধান পেরোনো, সেটা আমরা এই বইয়ের মধ্যে দেখতে পাই। বই দ্বন্দ্বের সুলুক সন্ধান দেয়। বই নতুন দ্বন্দ্বের দিশা দেখায়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনে কমরেড অভিজিৎ দাস স্মরণে প্রগতিশীল পুস্তক বিপণন কেন্দ্রের উদ্বোধক পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক ন্যায় মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক তথা প্রাক্তন সাংসদ শ্রী অলোকেশ দাস এই কথাগুলি বলেন উদ্বোধন মঞ্চে। তিনি বলেন, এই সময়ে দাঁড়িয়ে এমন একটি ঐতিহ্যশালী সংগঠনের রাজ্য সম্মেলনে পুস্তক বিপণীর উদ্বোধনের সুযোগ পেয়ে তিনি গর্ব অনুভব করছেন। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে পরিচিতিসত্তা থেকে বিভেদ, বিভাজনের রাজনীতির বিপদের প্রসঙ্গ। সি এ এ, এন আর সি থেকে বর্তমান এস আই আর কীভাবে এই বিভেদ, বিভাজনের পথ প্রশস্ত করছে সেই প্রসঙ্গও উঠে আসে তাঁর আলোচনায়। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদতে নয়া সাম্রাজ্যবাদী বিপদের প্রসঙ্গ। বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন প্রান্তে এই যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব আসলে পুঁজিবাদের সংকট থেকে বেরিয়ে আসার কৌশল। তবে বিশ্ব জুড়ে জায়গায় জায়গায় প্রতিরোধের চিত্রও দেখা যাচ্ছে। এদেশে আদানি, আম্বানিদের স্বার্থে কাজ করছে কেন্দ্রের সরকার আর শোষিত, বঞ্চিত মানষুকে বিভ্রান্ত করতে হিন্দুত্ববাদের চাষ করছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, যে লড়াই আমরা কর্মচারী সমাজ লড়ছি সেই লড়াইয়ে এই রাজ্য সম্মেলন দিশা দেখাবে এবং এই প্রগতিশীল পুস্তক বিপণীর বই এই দিকনির্দেশে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রগতিশীল পুস্তক বিপণন কেন্দ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, সম্মেলনকে কেন্দ্র করে এই প্রগতিশীল পুস্তক বিপণন কেন্দ্র শুধু রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিরই ঐতিহ্য নয়, অন্তর্ভুক্ত সমিতিগুলিও তাদের সম্মেলনে প্রগতিশীল পুস্তক বিপণীর আয়োজন করে থাকে। কর্মচারী হিসেবে আমরা যে লড়াই, আন্দোলন করছি, সেই সংগ্রাম পূর্ণতা পেতে পারে তখনই যদি আমাদের চেতনার দ্বারা আমাদের অর্থনৈতিক দাবির লড়াইকে গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে পারি। এর জন্য যে চেতনাসম্পন্ন দৃঢ় মানসিকতার প্রয়োজন, বই সেই লক্ষ্যে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বই পড়া শুধুমাত্র জ্ঞানার্জন নয়, পৃথিবীকে একটা নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার, উপলব্ধি করার একটা উপায়।

এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংগঠনের সভাপতি মানস দাস। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন একবিংশতিতম সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি বিশিষ্ট অধ্যাপক শ্রী বাদল দত্ত এবং সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত রায়। □

দীপঙ্কর বাগচী

একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের বিশেষ অতিথির বক্তব্য

সেক্টর-ওয়াইজ লড়াইয়ের উর্ধ্বে উঠে ঐক্যবদ্ধ এবং নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন গড়ে তোলাই হোক এই সময়ের করণীয়

গত ১০-১২ জানুয়ারী, ২০২৬ প্রণব চট্টোপাধ্যায় নগরের (কৃষ্ণনগর শহর) প্রশান্ত সাহা মঞ্চে অনুষ্ঠিত রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এ. শ্রীকুমার। সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

অল ইন্ডিয়া স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতিসমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির এই ২১তম সম্মেলনে আগত সমস্ত প্রতিনিধিদের আমি আন্তরিক বিপ্লবী অভিনন্দন জানাই।

কিছুক্ষণ আগেই অশোক ধাওয়ালে আপনাদের সামনে এক অসাধারণ বক্তব্য রেখেছেন, যেখানে তিনি আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করার ওপর জোর দিয়েছেন। যখন আমরা আন্দোলনের কথা বলি, তখন আমাদের বোঝা দরকার যে একটি 'সংগঠন' বা 'ফেডারেশন' এবং একটি 'আন্দোলন'-এর মধ্যে তফাৎ রয়েছে। আমাদের হাতে থাকা সমস্ত সম্পদ ব্যবহার করে আমরা আন্দোলন গড়ে তুলি। আর আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সবচেয়ে জরুরি হলো ঐক্য। আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। আমাদের সাধারণ সদস্যদের শিক্ষিত করতে হবে যে কর্মচারীদের আসল সমস্যা বা দাবিদাওয়াগুলো কী এবং কীভাবে তা সরকারের নীতির সঙ্গে যুক্ত। দেখুন, যখন আমরা লেবার কোড বা শ্রম কোডের কথা বলি, তখন আমাদের বুঝতে হবে যে এই শ্রম কোডগুলো সেই নয়া-উদারবাদী নীতিরই অংশ, যা গত ৩৪-৩৫ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে চাপিয়ে দিচ্ছে। তাই ভারতের শ্রমিক শ্রেণী তাদের সাধ্যমতো সারা দেশ জুড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের এই জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করছে।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে, আপনাদের লড়াইটা আরও কঠিন। আপনাদের একযোগে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার—উভয়ের বিরুদ্ধেই লড়তে হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সম্ভবত দেশের একমাত্র রাজ্য যেখানে পাবলিক সার্ভিস কমিশন (PSC) এবং এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জগুলোকে কার্যত অকেজো করে দেওয়া হয়েছে। আপনারা জানেন, এখানে পিএসসি-র কোনো কাজ নেই, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কোনো কাজ নেই। কেন? কারণ এখানে সব নিয়োগ বন্ধ! রিক্রুটমেন্ট ব্যান!

নিয়োগ না হওয়ার সমস্যাটা কী? আপনার বাড়িতে আপনার ছেলেমেয়েরা যোগ্য, উচ্চশিক্ষিত—কারও বি.টেক. ডিগ্রি আছে, কেউ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট, কারও কম্পিউটার ডিগ্রি আছে—সব আছে। কিন্তু সরকারী চাকরি পাওয়ার কোনো রাস্তা এখানে খোলা নেই। কোনো নিয়োগ নেই। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো একজন আদর্শ নিয়োগকর্তা (Model Employer) হওয়া। যখন রাষ্ট্র আদর্শ নিয়োগকর্তা হয়, তখন শিক্ষিত যুবকদের জন্য নিয়োগ নীতি থাকা বাধ্যতামূলক, যাতে সমাজের প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষরাও সাংবিধানিক সুরক্ষার মাধ্যমে সিভিল সার্ভিসে আসতে পারে। আমরা যদি একটি সমতাভিত্তিক সমাজ গড়তে চাই, তবে সিভিল সার্ভিসে সমাজের সমস্ত অংশের প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে।

সিভিল সার্ভিসের বুনিয়াদ হলো স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা দপ্তর। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কী চলছে? পশ্চিমবঙ্গের মেডিকেল কলেজগুলোতে কতজন স্থায়ী বা 'পাকা' কর্মচারী আছেন, আর কতজন অস্থায়ী? সুপ্রিম কোর্ট কী বলেছে? আর জি কর মেডিকেল কলেজের ঘটনার প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টও প্রশ্ন তুলেছে—আপনারা কীভাবে এই সমস্ত পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করছেন? কেন করছেন? আজ দেশের সর্বোচ্চ আদালত পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সামনে এই প্রশ্ন তুলে ধরেছে। দুর্ভাগ্যবশত, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত বেকার যুবসমাজ যা আশা করেছিল, তা তারা পাচ্ছে না। আপনারা জানেন পশ্চিমবঙ্গ কী। পশ্চিমবঙ্গ হলো সেই রাজ্য যেখানে স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, যেখানে অতীতে বিশাল গণজাগরণ হয়েছে। আমি বিস্তারিত ইতিহাসে যাচ্ছি না, কিন্তু বাংলা ভাগ করা, দেশভাগ—সবই ছিল ব্রিটিশদের চক্রান্ত। তাই বাংলার এক ঐতিহাসিক লড়াইয়ের সংস্কৃতি আছে। আপনারা লড়াই করতে প্রস্তুত। কিন্তু লড়াই কীভাবে চলবে? আন্দোলনের শক্তি কতটা? এটাই আজ ভাবার বিষয়। আজ পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার কী হাল? আমি কেরালা থেকে আসছি। সম্প্রতি কেরালা সরকার একটি তথ্য প্রকাশ করেছে। গত ৯ বছর ৯ মাসে কেরালা সরকার গৃহহীন মানুষদের জন্য ৪ লক্ষ ৭৬ হাজার ১৭৩টি বাড়ি তৈরী করে দিয়েছে। আর যখন চাবি হস্তান্তর করা হলো, সরকার স্পষ্ট করে দিল—বাড়ির সামনে কোনো মন্ত্রীর ছবি থাকবে না, মুখ্যমন্ত্রীর ছবি থাকবে না। কারণ, সম্মানজনক বাসস্থান পাওয়া দেশের প্রতিটি নাগরিকের অধিকার। এটা সরকারের দায়িত্ব, দয়া নয়। আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কেমন চলছে? কেরালা হলো একমাত্র রাজ্য যেখানে পুরোদমে সরকারী নিয়োগ চলছে। পিএসসি-র সর্বশেষ তথ্য বলছে, সারা দেশে পিএসসি-র মাধ্যমে যত নিয়োগ হয়েছে, তার ৫২ শতাংশ নিয়োগ একা কেরালা রাজ্য করেছে—ভারতের মানচিত্রে এক চিলতে একটা রাজ্য! প্রাইমারি হেলথ সেন্টার থেকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল—সবকিছুতে বিনামূল্যে চিকিৎসা মিলছে। কিডনি প্রতিস্থাপন, হার্ট বাইপাস সার্জারি, এমনকি ব্রেন সার্জারি—সব বিনামূল্যে কেরালায় সরকারী হাসপাতালে পাওয়া যায়। আমাদের জেলা হাসপাতাল বা জেনারেল হাসপাতালগুলোও পুরোপুরি সজ্জিত। প্রাইমারি হেলথ সেন্টারেও তিনজন করে নিয়মিত ডাক্তার, স্টাফ নার্স, ফার্মাসিস্ট—সবাই পাকা চাকরিতে বহাল আছেন। আর আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা? সারা দেশে আপনারা দেখছেন প্রাইমারি, হাইস্কুল আর সেকেন্ডারি স্কুলগুলোকে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে (Merging)। কেন্দ্রীয় সরকার বলছে সরকারী স্কুল বন্ধ করে দাও, তার বদলে রেসিডেন্সিয়াল স্কুল বা প্রাইভেট স্কুলের মতো স্কুল বানাও। কিন্তু কেরালায় আসুন, প্রাইমারি স্কুলেও কম্পিউটার ল্যাব আছে । হাইস্কুল ও হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে ল্যাপটপ দেওয়া হয়েছে । আমরা সরকারী স্কুল বন্ধ করছি না, বরং সরকারী স্কুলে আরও বেশি সুবিধা দিচ্ছি। প্রাইভেট ফাইভ-স্টার স্কুলে যা সুবিধা আছে, আমরা সরকারী স্কুলেও তাই দিচ্ছি। ভাবতে পারেন, আমাদের সরকারী স্কুলগুলো প্রাইভেট স্কুলের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে? কেউ চাইলে প্রাইভেট স্কুল খুলতেই পারে, বাধা নেই। কিন্তু, আমি জোর দিয়ে বলছি—কিন্তু, অভিভাবকরা এখন তাঁদের সন্তানদের প্রাইভেট স্কুলের বদলে সরকারী স্কুলে পাঠাতে বেশি আগ্রহী। কেন? কারণ সেখানে শিক্ষক পদে পূর্ণ নিয়োগ আছে। বই বিনামূল্যে, ইউনিফর্ম বিনামূল্যে, খাবার বিনামূল্যে, কম্পিউটার শিক্ষা বিনামূল্যে—সব সরকার দিচ্ছে। আপনি গরিব হোন বা ধনী, রাষ্ট্র আপনাকে সবকিছু দেবে। নীতি আয়োগ (NITI Aayog) কী বলছে? নীতি আয়োগ তো বামপন্থীরা চালায় না, চালায় বিজেপি। তারাও বলছে—গরিবদের ঘর দেওয়ার ক্ষেত্রে কেরালাই দেশের রোল মডেল। শিক্ষার ক্ষেত্রে কেরালা সেরা। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কেরালা সেরা। এটা নীতি আয়োগের রিপোর্ট। আমরা রাস্তা বানাচ্ছি, যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করছি। রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন আগে লোকসানে ছিল, এখন 'নো লস নো প্রফিট'-এ চলছে। আমরা টাকা কামানোর জন্য বাস চালাই না, রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য চালাই। কেরালা আজ পর্যটনে সেরা। অপরাধের হার কমছে কারণ সরকার মাফিয়া রাজ খতম করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কী করছে? আপনারা জানেন, ফিন্যান্স কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রের মোট রাজস্বের একটা অংশ রাজ্যগুলোর পাওয়ার কথা। একে বলে ভার্টিক্যাল (কেন্দ্র ও রাজ্যের ভাগ) এবং হরাইজন্টাল (রাজ্যগুলোর নিজেদের মধ্যে ভাগ) ডিভিশন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই হরাইজন্টাল ভাগে বৈষম্য করছে। উত্তরপ্রদেশ টাকা পায়, অন্ধ্রপ্রদেশ পায়, বিহার পায়, মহারাষ্ট্র পায়—কিন্তু কেরালা পায় না, কর্ণাটক পায় না, তামিলনাড়ু পায় না। কেন? কারণ সেখানে বিজেপি বিরোধী সরকার আছে। দ্বিতীয়ত, পেট্রোল-ডিজেলের ওপর সেস (Cess) আর সারচার্জ, কাস্টমস ডিউটি আর এক্সসাইজ ডিউটি বাবদ কেন্দ্র যে হাজার হাজার কোটি টাকা তোলে, তার এক পয়সাও তারা রাজ্যগুলোকে দেয় না। সেই কারণেই জিএসটি কাউন্সিলে রাজ্যের অর্থমন্ত্রীরা দাবি করছেন পেট্রোলিয়ামকে জিএসটি-র আওতায় আনা হোক। কিন্তু কেন্দ্র রাজি নয়, কারণ তারা পুরো টাকাটা নিজেদের পকেটে রাখতে চায়।

কেরালা গরিব রাজ্য, কিন্তু আমরা বাইরে থেকে এবং বাজার থেকে টাকা তুলে কেরালা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ডিং বোর্ড (KIFB) তৈরী করেছি। সেই টাকা দিয়ে উন্নয়ন হচ্ছে। সিএজি (CAG) প্রশ্ন করছে, আপনারা জমি কিনছেন কেন? আমরা বুক ফুলিয়ে বলেছি—হ্যাঁ, আমরা সেতুর জন্য জমি কিনেছি, স্কুলের জন্য জমি কিনেছি, হাসপাতালের জন্য জমি কিনেছি। আমরা করেছি এবং আমরা করব। কেরালাতে এখন কংগ্রেস আর বিজেপির মধ্যে এক গোপন আঁতাত চলছে। তাদের একমাত্র লক্ষ্য বামপন্থীদের হারানো। কেন? কারণ কেরালায় সরকারের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিষ্ঠান-বিরোধী হাওয়া (Anti-incumbency) নেই, কোনো দুর্নীতি নেই। তাই তারা সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছে। আপনারা জানেন বিষ—এক ফোঁটা বিষ হাজার মানুষকে মারার জন্য যথেষ্ট। শবরীমালা মন্দিরেও তারা চক্রান্ত করেছিল। কিন্তু হাইকোর্টের নির্দেশে যখন মন্দিরের প্রধান পুরোহিত বা তন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হলো, তখন বিজেপি-কংগ্রেস চেঁচামেচি শুরু করলো। সব ফাঁস হয়ে গেছে। ২০২১ সালে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED) মুখ্যমন্ত্রীকে সোনা পাচার মামলায় ফাঁসাতে চেয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'আমার লুকোনোর কিছু নেই, তদন্ত করুন।' কিন্তু যে ইডি অফিসার, রাধাকৃষ্ণন, এই চক্রান্ত করছিল—চার দিন আগে তাকেই ঘুস নেওয়ার অভিযোগে এবং কোটি কোটি টাকার অবৈধ সম্পত্তির দায়ে ইডি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। খবরের কাগজ খুলে দেখুন। সত্যের জয় হয়েছে। কেরালায় লক্ষ লক্ষ টাকার বেতনে যুবকরা স্টার্ট-আপ মিশনে কাজ পাচ্ছে। এটা বামপন্থী সরকারের ১০ বছরের ফসল। আর কংগ্রেস-বিজেপি আঁতাত করে আমাদের হারাতে চাইছে।

কমরেডগণ, অল ইন্ডিয়া ফেডারেশনের কাজ বাড়ছে। আপনাদের কাছে অনুরোধ, পুরোনো নথি বা ম্যাগাজিন থাকলে সুকোমল সেন ভবনে পাঠান। আমরা ফরিদাবাদে জমি কিনে সুকোমল সেন ভবন বানিয়েছি। সেখানে সুকোমল সেনের আবক্ষ মূর্তি আছে। মেট্রো স্টেশন থেকে মাত্র ৩০০ মিটার দূরে। সেখানে ৮০ জন থাকার ব্যবস্থা, ১৫০ জনের মিটিং হল, লাইব্রেরি—সব আছে। আপনাদের অবদানের জন্য ধন্যবাদ। এই ভবনকে ব্যবহার করতে হবে। আমরা সেখানে ট্রেড ইউনিয়ন ক্লাস, মিডিয়া ক্লাস করাচ্ছি। সময়ের সাথে সাথে আমাদের কাজের ধরনেও বদল আনতে হবে। আপনারা ভালো নেতা, কিন্তু সংগঠনকেও ভালো হতে হবে। আমরা অলস হয়ে বসে থাকলে কোনো ফল পাব না। দেখুন, কমরেড বিশ্বজিৎ আমাকে তিন দিন থাকতে বলেছিলেন। কিন্তু কাল আমাকে ভুবনেশ্বর যেতে হবে, ১২ তারিখে টাটা, তারপর তামিলনাড়ু, তারপর আবার বেলুড়। এই গতিতেই আমাদের কাজ করতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করতে হবে। আর এস এস সরাসরি কিছু বলে না, তারা পরোক্ষভাবে মানুষের মনের ভেতর, হৃদয়ের ভেতর ঢুকে বিষ ছড়ায়। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ—বাড়িতে গিয়ে নিজেদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলুন। প্রতিদিন আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা। বোঝার চেষ্টা করুন নতুন প্রজন্ম কী ভাবছে। আমাদের একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে যে 'আমরা সব জানি, আর আমাদের ছেলেমেয়েরা কিছু জানে না।' এটা ভুল। আমরা কিছু জানি না, ওরাই সব জানে। এটাই সত্যি। তাই তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে তর্ক করুন, বিতর্ক করুন। সমাজ কীভাবে বদলাচ্ছে তা বুঝুন। শুধু নিজেদের ইগো নিয়ে বসে থাকবেন না যে আমি ৬০-৭০ বছরের নেতা, আমি সব জানি। নতুন যে ছেলেটা চাকরিতে ঢুকেছে, তার সঙ্গে কথা বলুন। নিজেদের আপডেট করুন। আমাদের ফেডারেশনেও আমরা কাজের ধরন বদলেছি। আগে একজন সব ঠিক করত, এখন আমরা সেক্রেটারিয়েটে আলোচনা করি। কমরেড বিশ্বজিৎ, মহুয়া, সুতপাদের জিজ্ঞেস করুন—আমরা ফোনে, মিটিংয়ে সব আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিই। এই ডিবেট বা বিতর্ক থেকেই সঠিক পথ বেরিয়ে আসে। শেষ করার আগে বলি, আমাদের লড়াই করতে হবে। নয়া-উদারবাদী নীতি আপনার খাওয়া-দাওয়া, কথাবার্তা, পোশাক-আশাক, চিন্তা-ভাবনা—সব কিছুকে প্রভাবিত করছে। তাই খণ্ড খণ্ড লড়াই নয়, আমাদের সেক্টর-ওয়াইজ লড়াইয়ের উর্ধ্বে উঠে এক ঐক্যবদ্ধ এবং নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। একমাত্র সেই শক্তিশালী আন্দোলনই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নীতি পরিবর্তন করতে পারে।

লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হোন। ধন্যবাদ। □

রাজীব বসু

একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশন

গত ১০ই জানুয়ারী '২৬ সকাল ন'টায় রক্তপতাকা উত্তোলন এবং শহীদ বেদীতে মাল্যদানের পর সারা রাজ্যের বিভিন্ন জেলা, অঞ্চল ও সমিতিগুলি থেকে আগত প্রতিনিধি, ভাতৃপ্রতিম সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ, পার্শ্ববর্তী রাজ্য ত্রিপুরার কর্মচারী সমন্বয় কমিটি (এইচ বি রোড)-এর প্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবক ও অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দের উপস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ

বাদল দত্ত, অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি

সরকারী কর্মচারী সমিতিসমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। প্রথমেই সঙ্গীত পরিবেশন করেন রাজ্য

মনোজ সাউ, ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক

কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক শাখা। এরপর রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি মানস দাস, সহ সভাপতিদ্বয় রবীন্দ্রনাথ সিংহ রায় এবং নিবেদিতা দাশগুপ্তকে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়। এছাড়াও সুমন কান্তি নাগের নেতৃত্বে, অভিজিৎ বোস, রুদ্রকান্ত চৌধুরী ও সোমেন ঘোষকে নিয়ে ক্রেডেনশিয়াল কমিটি এবং সুতপা হাজরা ও রুবি সিনহার নেতৃত্বে, কবিতা টুডু, রিঙ্কু ভট্টাচার্য্য, পিকু ব্রহ্ম, তানিয়া বক্সী, ম্যাডোনা দাস এবং গোপা দাসকে নিয়ে অনুলিখন কমিটি গঠিত হয়। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ সকলেই স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য হিসাবে কাজ করবেন এই ঘোষণা করা হয় এবং স্টিয়ারিং কমিটি ও অনুলিখন কমিটির সদস্যদের মঞ্চে এসে আসন গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়। এরপর সভাপতি মানস দাস অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও অধ্যাপক বাদল দত্ত, অশোক ধাওয়ালে, উদ্বোধক ও সারা ভারত কৃষক সভার সভাপতি, কমরেড এ. শ্রীকুমার, বিশেষ অতিথি ও সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক, মহুয়া রায়, সম্পাদক, ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় সমিতি (এইচ বি রোড), মনোজ সাউ, অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক, ১২ই জুলাই কমিটি সহ অন্যান্য ভাতৃপ্রতিম সংগঠনের প্রতিনিধিদের মঞ্চে এসে আসন গ্রহণের অনুরোধ জানান।

সংগ্রামী হাতিয়ারের প্রাক্তন সম্পাদক কমরেড প্রণব চট্টোপাধ্যায়, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সহ সভাপতি কমরেড প্রশান্ত সাহার স্মরণে দুটি আলাদা শোক প্রস্তাব সহ একটি সাধারণ শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন সভাপতি মানস দাস ও প্রস্তাব উত্থাপনের পরে কিছুক্ষণ নীরবতা পালন করা হয়।

এরপর অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও অধ্যাপক বাদল দত্তকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি মানস দাস। সম্মেলনের উদ্বোধক তথা সারা ভারত কৃষক সভার সভাপতি অশোক ধাওয়ালেকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, বিশেষ অতিথি তথা সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এ. শ্রীকুমারকে সম্বর্ধিত করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত রায় এবং ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় সমিতি (এইচ বি রোড)-এর সম্পাদক মহুয়া রায়কে সম্বর্ধিত করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্যতম সহ সম্পাদক শাশ্বতী মজুমদার। মঞ্চে উপবিষ্ট অন্যান্য ভাতৃপ্রতিম সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে সম্বর্ধিত করেন দেবব্রত রায়। এরপর স্বাগত ভাষণ দেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি বাদল দত্ত। তিনি তাঁর বক্তব্যের প্রথমেই ১০-১২ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ২১তম রাজ্য সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধি ও অতিথিদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানান। তিনি নদীয়া জেলার ভৌগোলিক অবস্থান, ইতিহাস এবং সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের বর্ণনা করে ভাষণের সূচনা করেন। নদীয়া জেলা ঐতিহ্যের পীঠস্থান। তিনি বৌদ্ধ জনপদ থেকে শুরু করে পাল, সেন এবং সুলতানি আমল হয়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সুদীর্ঘ রাজত্বকাল পর্যন্ত ইতিহাসের ধারা ব্যাখ্যা করেন। জেলার জনবিন্যাসে দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের প্রভাব এবং বর্তমানের কৃষি ও শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির চিত্র তুলে ধরেন। নবদ্বীপকে 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' হিসেবে অভিহিত করে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্তিত মানবতাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার গুরুত্ব স্মরণ করেন। তিনি বলেন, নদীয়ার সমৃদ্ধ সংস্কৃতির মূলে রয়েছে লালন ফকিরের দেহতত্ত্ব, বাউল দর্শন এবং সুফিবাদী চিন্তাধারা। এই দর্শনগুলো ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যে মানবধর্মের জয়গান করেছে, তা বাংলার ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেছে। তিনি নীল বিদ্রোহ থেকে শুরু করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে তিতুমীরের লড়াই এবং পরবর্তীকালে ছাত্র-যুব-শ্রমিক-কর্মচারীদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা স্মরণ করেন। তিনি ১৯৮২ সালে কৃষ্ণনগরেই অনুষ্ঠিত রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ৭ম রাজ্য সম্মেলনের কথা উল্লেখ করেন। পরিস্থিতির বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি বর্তমান বিশ্ব ও জাতীয় পরিস্থিতির নেতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ

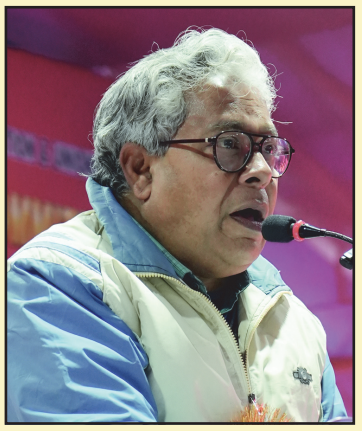

দেবাশীষ কুণ্ডু, পলিটেকনিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি

করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং নয়া উদারবাদী অর্থনীতির উত্থানের ফলে শ্রমজীবী মানুষের শোষণ বেড়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। বিজ্ঞান ও

সন্দীপ রায়, সাধারণ সম্পাদক, পঞ্চায়েত যৌথ কমিটি

প্রযুক্তির (যেমন এ আই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) অগ্রগতি ঘটলেও তার সুফল পুঁজিপতিদের দখলে যাচ্ছে, আর সাধারণ মানুষ কর্মহীন হচ্ছে। জাতীয় ক্ষেত্রে, বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকারের 'কর্পোরেট-হিন্দুত্ববাদী আঁতাত' এবং আর এস এস-এর 'এক দেশ এক সংস্কৃতি' প্রকল্পের তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। শ্রম কোড পরিবর্তন, ঠিকাদারিকরণ এবং গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীকে বিপন্ন করা হচ্ছে বলে তিনি সতর্ক করেন। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেন, গত দেড় দশক ধরে রাজ্যে দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন এবং স্বৈরাচারী শাসন চলছে। বামফ্রন্ট সরকারের অর্জিত সাফল্যসমূহ—যেমন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, ভূমি সংস্কার এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার—আজ হুমকির মুখে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য তিনি বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তির পুনরুত্থানকে অনিবার্য বলে মনে করেন। শাসক শ্রেণী শুধুমাত্র বলপ্রয়োগ নয়, বরং 'উত্তর-সত্য' (Post-truth) এবং অন্ধ বিশ্বাসের প্রসারের মাধ্যমে মানুষের মগজ দখল করতে চাইছে। এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিকল্প প্রগতিশীল সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। তিনি রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এবং মুজফ্‌ফর আহমদের উত্তরাধিকারকে ধারণ করে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারীদের অগ্রণী সংগঠন হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি বিশ্বাস করেন, সঠিক মতাদর্শ ও লড়াইয়ের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এই সংগঠনই বর্তমানের প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করে কর্মচারীদের সঠিক পথ দেখাতে পারবে। সম্মেলনের সফলতা কামনা করে এবং অর্জিত সাফল্য রক্ষার শপথ নিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতির স্বাগত ভাষণের পর উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন সম্মেলনের উদ্বোধক, সারা ভারত কৃষক সভার সভাপতি অশোক ধাওয়ালে এবং তিনি তাঁর বক্তব্যের পর ২১টি বাতি জ্বেলে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উদ্বোধকের বক্তব্যের পর সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহবায়ক মনোজ সাউ, পঞ্চায়েত যৌথ কমিটির পক্ষে সন্দীপ রায়, পলিটেকনিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির পক্ষে দেবাশীষ কুণ্ডু, স্টিয়ারিং কমিটির পক্ষে পার্থপ্রতিম দে, কেন্দ্রীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অন্বেষা বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতির পক্ষে তাপস সরকার এবং সারা ভারত বিশ্ববিদ্যালয় কনফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অঞ্জন ঘোষ।

পরবর্তীকালে বক্তব্য রাখেন নদীয়া জেলা সি আই টি ইউ-এর সাধারণ সম্পাদক এস এম সাদি। নদীয়া জেলার কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব

নদীয়া জেলার শ্রমিক আন্দোলনের নেতা এস এম সাদি

কমরেড মানিকলাল ব্যানার্জীর আকস্মিক প্রয়াণের কারণে তিনি উদ্বোধনী অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তিনি তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব কমরেড মানিকলাল ব্যানার্জীর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেন। তিনি বলেন, যে-কোনো গণসংগঠনের শক্তির ভিত্তি হলো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সম্মেলন পরিচালনা করা। বর্তমানে সরকারী কর্মচারীরা চরম সন্ত্রাস, 'থ্রেট কালচার' এবং যখন-তখন বদলির হুমকির মুখে দাঁড়িয়েও যেভাবে সাহসের সাথে লড়াই করছেন, তাকে তিনি স্যালুট জানান। তাঁর মতে, দিল্লির বা রাজ্যের—যে-কোনো সরকারের

পার্থপ্রতিম দে, রাজ্য নেতৃত্ব, স্টিয়ারিং কমিটি

নীতির (Policy) পেছনে একটি নির্দিষ্ট রাজনীতি থাকে। বর্তমান শাসকদলের লক্ষ্য হলো মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরী করা এবং সরকারী পরিষেবাগুলিকে

তাপস সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতির রাজ্য নেতৃত্ব

কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়া। তিনি সতর্ক করেন যে, সাধারণ মানুষের সাথে কর্মচারীদের দূরত্ব তৈরী করা শাসকশ্রেণীর একটি কৌশল। তাই কর্মচারীদের নিজেদের কেবল 'গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট' না ভেবে 'মানুষের বন্ধু' হিসাবে কাজ করতে হবে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, বামফ্রন্ট সরকার ও কমরেড জ্যোতি বসু সবসময় কর্মচারীদের সাধারণ মানুষের বন্ধু হিসাবে গণ্য করতেন। বর্তমান প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের সাথে গভীর বন্ধুত্ব ও জনসংযোগই হলো কর্মচারীদের সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ। সবশেষে, ২০২৬ সালের পরিবর্তনের লড়াই এবং নীতি পরিবর্তনের লক্ষ্যে একটি শাণিত ও আদর্শগতভাবে ইস্পাতদৃঢ় সংগঠন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। □

রাজীব বসু

প্রধান অতিথি, শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব আভাস রায় চৌধুরীর বক্তব্য

আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে নামি

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ২১তম এই রাজ্য সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ, অন্যান্য কমিটির সদস্যবৃন্দ, এখানে উপস্থিত প্রবীণ প্রাক্তন নেতৃবৃন্দ, সর্বভারতীয় কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ, অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি সহ সমগ্র অভ্যর্থনা কমিটি এবং কমরেড প্রতিনিধিবৃন্দ, আপনাদের সবাইকে আমি আমাদের সংগঠন ''সি আই টি ইউ, পশ্চিমবঙ্গ কমিটি''-র পক্ষ থেকে অভিনন্দন, শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানাচ্ছি।

এখানে আপনাদের এই সম্মেলনে খানিকটা অংশ নেওয়ার যে সুযোগ একজন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী হিসাবে পেয়েছি, ব্যক্তিগতভাবে অন্তত কালকে বিকেল বেলা থেকে যা আপনারা আলোচনা করেছেন শুনেছি, তার মধ্য দিয়ে যে শেখা অন্তত ব্যক্তিকর্মী হিসেবে, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী হিসেবে আমার হয়েছে—তাতে প্রথমেই অকপটে বলতে হয় যে সেটা ব্যক্তিগত ভাবে আমার কাছে একটা প্রাপ্তি।

আমরা একসঙ্গে কাজ করি। শ্রমিক-কর্মচারী যৌথ আন্দোলনে আমরা থাকি, বিভিন্ন লড়াই আন্দোলনে থাকি। ফলে এটা আমাদের সংগঠনের কাছেও একটা প্রাপ্তি। আপনাদের লড়াই আন্দোলনের অভিজ্ঞতার কথা, আপনারা কালকে অনেকে বলেছেন। সবারই ভাষা এক ছিল না, কিন্তু বিষয়বস্তু এক অনেকের মধ্যেই। সঠিক ভাবেই আপনাদের কেউ কেউ বলেছেন—জেলা না সমিতি আমি এই মুহূর্তে খেয়াল করতে পারছি না—যে রাজ্য প্রশাসন প্রাইভেট কোম্পানির ম্যানেজমেন্টে পরিণত হয়েছে। সত্যিই সেটা হয়েছে।

আমাদের চারপাশের অভিজ্ঞতার কথা যদি আমরা বিচার করি, একজন ট্রেড ইউনিয়নের কর্মী হিসাবে আমাদেরও ধারণা যে সরকারটা প্রাইভেট কোম্পানির ম্যানেজমেন্টে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন সরকারের সঙ্গে আমাদেরকেও মতামত দেওয়া-নেওয়া করতে হয়, লড়ে নিতে হয়, দাবি জানাতে হয়। আমাদেরও যা অভিজ্ঞতা, তাতে এটাই মনে হয়েছে যে এরকম অযোগ্য ভাবে কোথাও কোনও সরকার চলছে না। আপনারা এই সরকারের ভিতরে আছেন, ফলে এটা আরও মর্মে মর্মে আপনারা উপলব্ধি করছেন। আমরা সরাসরি এর ভিতরে নেই, কিন্তু আমাদেরও শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে বা সামগ্রিকভাবে রাজ্যের শ্রমিক-কর্মচারী আন্দোলনের সামনে বা রাজ্যবাসী হিসাবে আমাদের মাথার ওপর যে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারটি রয়েছে, সেটির আচরণ অন্তত্ত কোনও 'নির্বাচিত সরকারের' মতন নয়।

বুর্জোয়া ব্যবস্থাতে ফিউডাল ব্যবস্থার সঙ্গে একটা পার্থক্য থাকে। সামন্ততান্ত্রিক একটা ব্যবস্থার সঙ্গে একটা বুর্জোয়া ব্যবস্থার পার্থক্য তো এইটা যে, বুর্জোয়া ব্যবস্থায় যে প্রশাসন, সেই প্রশাসন হলো লিগ্যাল এবং যুক্তিভিত্তিক। প্রশাসন হলো র‍্যাশানাল— মানে আইনি, যুক্তিভিত্তিক। এটা একদিনে তৈরী হয়নি। পৃথিবীতে সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে লড়াই করে যখন অর্থনীতিতে পরিবর্তন ঘটেছিল, সেই তখন থেকেই পার্থক্যের শুরু। এখানে মাননীয় অধ্যাপক বাদলদার সামনে অর্থনীতি নিয়ে বলতে যাওয়াটা বাতুলতা হবে, আমি সে ভুল করব না। কিন্তু এটা সত্যি যে, অর্থনীতিতে যখন লড়াই হচ্ছে, সমাজে যখন লড়াই হচ্ছে এবং সেই লড়াইয়ের অনুসারী রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে নেওয়ার জন্য যখন লড়াই হচ্ছে, সেই সময়েই রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে আজকে যেটাকে আমরা ব্যুরোক্রেসি বলি, যেটাকে আমরা আমলাতন্ত্র বলি, তার সূত্রপাত ঘটেছিল এবং আজকের বুর্জোয়া রাষ্ট্র, আধুনিক রাষ্ট্র, এই আমলাতন্ত্রকে বাদ দিয়ে অন্তত্তপক্ষে এখনো পর্যন্ত চলতে পারছে বলে মনে হচ্ছে না। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্রের ধরনটা অন্যরকম, সেটা আলাদা। সে আলোচনাটা অন্যত্র হবে।

কিন্তু এই যে কথাটা বললাম, রাজ্য প্রশাসন প্রাইভেট কোম্পানির ম্যানেজমেন্টে পরিণত হয়েছে। মানে যুক্তিভিত্তিক নয়, আইনি নয়, লিগ্যাল নয়, র‍্যাশনাল নয়—এই সরকারটা যা খুশি তাই করতে পারে এবং যা খুশি তাই করার জন্য, প্রাইভেট কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট যেমন তার কর্মচারী, তার শ্রমিক—তাদেরকে ছাঁটাই করার জন্য, তার মুনাফাকে বাড়ানোর জন্য সে যেমন ইচ্ছে তেমন কাজ করতে পারে—সেটাই করছে, অন্যভাবে করছে। প্রাইভেট কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট তার নিজস্ব গুন্ডাবাহিনী তৈরী করে, নিজস্ব মাস্তানের দল তৈরী করে, এই সরকারের শাসক দলও সেটাই করছে এবং নির্বিবাদে করতে পারছে। আমি আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে বলছি, আমি আসানসোল, দুর্গাপুর, বর্ধমান—এই শিল্পাঞ্চল থেকে এসেছি। কয়লা খনি অঞ্চলগুলোতে আমরা যারা কাজ করি, এইরকম অভিজ্ঞতা, প্রাইভেট কোম্পানির ম্যানেজমেন্টের মালিকের নিজস্ব গুন্ডাবাহিনী ছিল—এই অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। তাহলে এই যে প্রাইভেট কোম্পানির ম্যানেজমেন্টে পরিণত হওয়া, এটা আজকে রাজ্য সরকারের দপ্তরের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি এই কথাটা শুধু এই জন্য বললাম, এইটা শুধু আপনাদের অভিজ্ঞতার কথা নয়, আপনারা যখন লড়াই করবেন আগামী দিনে---আপনাদের এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে যে লড়াইয়ের রূপরেখা আপনারা তৈরী করবেন---আপনাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে বাইরের শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতার সাযুজ্য আছে। ফলে আমরাও আছি আপনাদের সঙ্গে। আপনাদের লড়াইয়ে আমরা আছি, আগামী দিনেও আমরা থাকব।

দু'নম্বর কথা, কালকে আমাদের এক কমরেড বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রশ্ন রেখেছিলেন যে—আগামী দিনে শ্রমিক আন্দোলন, কর্মচারী আন্দোলন—তার ভবিষ্যৎ কী? এটা শুধু আমাদের রাজ্যে নয়, দেশে নয়, গোটা দুনিয়া জুড়েই এইটা একটা বড় প্রশ্ন। আমরা যারা মার্ক্সবাদী, তারা এই কথাটা মনে রাখি যে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে—আমাদের এই সমাজ শ্রেণী বিভক্ত---শ্রেণী বিভক্ত সমাজে যতক্ষণ পর্যন্ত পুঁজির শোষণ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর লড়াই---তার যে ঐতিহাসিক সত্যতা—সেটা থাকবেই। কিন্তু আমাদের দেশে, আমাদের রাজ্যে এই লড়াইটা কি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক লড়াই? আপনাদের লড়াই কি শুধুমাত্র ডিএ পাওয়ার লড়াই? আপনাদের লড়াই কি শুধুমাত্র শূন্যপদ পূরণের লড়াই? আপনাদের লড়াই কি শুধুমাত্র কন্ট্রাকচুয়াল কর্মচারীদের স্থায়ীকরণের লড়াই? এর বাইরে আপনাদের কি আর কোনো ভূমিকা নেই? অবশ্যই আছে।

এই রাজ্যে প্রশাসনের, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে রূপান্তর---প্রাইভেট কোম্পানির ম্যানেজমেন্টে পরিণত হওয়া—এর বিরুদ্ধে লড়াইটাও তো আপনাদের লড়াই। ফলে এখন অর্থনীতি এবং রাজনীতিকে আলাদা করা যায় না। আমাদের রাজ্যে এই যে বিভাজনটা তৈরী করার চেষ্টা করা হচ্ছে---প্রাইভেট কোম্পানির ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে লড়াই, আর রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই—এই দুটোকে গুলিয়ে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। ফলে এই লড়াইটা কিন্তু রাজনৈতিক লড়াই।

আমি তিনটে কথা বলব ঃ এক, আমাদের রাজ্যের বর্তমান সরকার---তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার---গত ১৪ বছরে রাজ্যের অর্থনীতির ভিতকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আমাদের রাজ্যে, আমাদের রাজ্যে শিল্প কোথায়? কৃষি কোথায়? কর্মসংস্থান কোথায়? সরকারী দপ্তরে নিয়োগ কোথায়? এই যে শূন্যপদ, এই যে অস্থায়ী কর্মী, এই যে চুক্তিভিত্তিক কর্মী—এগুলো তো অর্থনীতির সংকটেরই বহিঃপ্রকাশ। এই অর্থনীতির সংকটকে আড়াল করার জন্য, এই অর্থনীতির সংকটকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য তারা রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়নকে নিয়ে এসেছে। তারা রাজনীতিতে দুর্নীতিকে নিয়ে এসেছে। তারা রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতাকে নিয়ে এসেছে।

দুই, আমাদের রাজ্যে এই যে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার—এই সরকার আর এস এস-বিজেপির সঙ্গে একটা গোপন আঁতাত তৈরী করেছে। এই আঁতাতটা কেন? এই আঁতাতটা আমাদের রাজ্যে বামপন্থী শক্তিকে দুর্বল করার জন্য, বামপন্থী আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য, শ্রমিক-কর্মচারী আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য। তারা চায় না যে আমাদের রাজ্যে কোনো শক্তিশালী বিরোধী শক্তি গড়ে উঠুক। তারা চায় না যে আমাদের রাজ্যে কোনো শক্তিশালী শ্রমিক-কর্মচারী আন্দোলন গড়ে উঠুক। তাই তারা এই আঁতাতটা তৈরী করেছে।

তিন, আমাদের রাজ্যে এই যে পরিস্থিতি—এই পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য আমাদের কী করতে হবে? আমাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আমাদের শ্রমিক-কর্মচারী আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। আমাদের বামপন্থী আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। আমাদের সাধারণ মানুষকে এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সচেতন করতে হবে। আমাদের সাধারণ মানুষকে এই লড়াইয়ে শামিল করতে হবে।

আমি আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি—আসুন, আমরা সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ হই। আসুন, আমরা সবাই মিলে এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে লড়াই করি। আসুন, আমরা সবাই মিলে আমাদের রাজ্যের ভবিষ্যৎকে রক্ষা করি।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। ইনকিলাব জিন্দাবাদ! সি আই টি ইউ জিন্দাবাদ! রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি জিন্দাবাদ! □

উৎসর্গ মিত্র

একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশের বার্তা

কেন্দ্র ও রাজ্যের স্বৈরাচারী শাসককে হটাতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন জরুরি

গত ১০-১২ জানুয়ারী, ২০২৬ প্রণব চট্টোপাধ্যায় নগরের (কৃষ্ণনগর) প্রশান্ত সাহা মঞ্চে অনুষ্ঠিত রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে ১২ জানুয়ারী দুপুরে কৃষ্ণনগরের কারবালা মাঠে প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশান্ত সাহা মঞ্চে সম্মেলন শেষ হওয়ার পর নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা সহ অন্যান্য প্রতিনিধিগণ অভ্যর্থনা কমিটি আয়োজিত বাসে সুশৃঙ্খলভাবে প্রকাশ্য সমাবেশে আসেন। প্রকাশ্য সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সি আই টি ইউ নেতৃত্ব আভাস রায়চৌধুরী এবং সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির নেতৃত্ব দেবলীনা হেমব্রম।

গণসঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ্য সমাবেশের সূচনা হয়। পরিবেশন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, নদীয়া জেলার সাংস্কৃতিক শাখা। এর পরে সলিল-সুকান্ত স্মরণে একটি উপস্থাপনা রাখেন শিল্পীদ্বয় মেঘনা ও শ্রেয়া। এরপর প্রকাশ্য সমাবেশের মূল কাজ শুরু হয়। ততক্ষণে সভাস্থল কারবালা মাঠ জনসমাগমে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। প্রকাশ্য সমাবেশ পরিচালনা করেন একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন থেকে পুনর্নির্বাচিত সভাপতি মানস দাস। প্রকাশ্য সমাবেশে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন পুনর্নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। তিনি বলেন, আমরা সফল সম্মেলন শেষ করে প্রকাশ্য সমাবেশে উপস্থিত হয়েছি। আমরা এই সম্মেলন থেকে শপথ নিয়েছি যে অতীতেও যে ঐতিহ্য বজায় রেখে কর্মচারী আন্দোলন অগ্রসর হয়েছিল সাধারণ মানুষের সমর্থন নিয়ে, সেই অগ্রগতির ঐতিহ্যকে ধারণ করেই আগামী দিনেও পশ্চিমবঙ্গে মানুষের অধিকারের ওপরে যে আক্রমণ সংগঠিত হচ্ছে তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কর্মচারীরা ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইয়ের ময়দানে থাকবে। আগামী দিনে আমাদের নিয়োগকর্তার নির্বাচন আছে। সাধারণ গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ তার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে রাস্তায় নামছেন। সেই সাধারণ মানুষের আন্দোলন আর কর্মচারী আন্দোলন পৃথক কোনো আন্দোলন নয়। আমরাও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমাদের প্রশাসনের অভ্যন্তরে এবং প্রশাসনের বাইরেও একজন নাগরিক হিসেবে, সমাজের সচেতন নাগরিক হিসেবে আপনারা যে ভূমিকা প্রতিপালন করছেন সেই দায়িত্ব কর্মচারীদেরও বর্তায়, সেই দায়িত্ব রূপায়ণেও আগামী দিনে কর্মচারী সমাজ সমস্ত ভয়-ভীতি, সমস্ত ধরনের বিভ্রান্তিকে উপেক্ষা করে যাতে কর্মচারীদের সমবেত করা যায়, ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই আন্দোলনে যুক্ত হওয়া যায়, রাস্তাই একমাত্র পথ—সেই রাস্তা খুঁজে নেওয়ার শপথ আমরা সম্মেলন মঞ্চ থেকে গ্রহণ করেছি। সম্মেলন থেকে আমাদের ৩০ জনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়েছে। সারা রাজ্যের প্রান্তর থেকে শুরু করে কলকাতা পর্যন্ত, নবান্ন পর্যন্ত—একদম পাহাড় থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত এই সংগঠন আগামী দিনে লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে নবান্নর ১৪ তলাকে কাঁপিয়ে দেওয়ার শপথ গ্রহণ করেছে। একই সাথে সারা রাজ্যব্যাপী, দেশব্যাপী প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে শুরু করে মানুষের অধিকার থেকে শুরু করে যে লুটের রাজত্ব চলছে, সেই লুটে খাওয়াদের বিরুদ্ধে খেটে খাওয়া মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামেও কর্মচারীরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাস্তার আল পথ ধরে আগামী দিনেও রাস্তায় থাকবে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আগামী ২১ ফেব্রুয়ারী থেকে ১০ মার্চ পর্যন্ত প্রত্যেকটা জেলা, প্রত্যেকটা ব্লক, পঞ্চায়েত পর্যন্ত কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীরা ঐক্যবদ্ধভাবে সেই সমস্ত প্রান্তিক স্তরের মানুষের দাবিদাওয়া নিয়ে, কর্মচারীদের দাবিদাওয়া নিয়ে জেলা ভিত্তিক জাঠা সংগঠিত করবে এবং আগামী ১০ মার্চ কলকাতায় কেন্দ্রীয় সমাবেশের দিন কর্মচারীদের দখলেই থাকবে কলকাতার রাজপথ। সেই শপথ, সেই অঙ্গীকার নিয়েই আগামী দিনের পশ্চিমবঙ্গে গুণগত পরিবর্তন ঘটানোর জন্য আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে আমার, আপনার, খেটে খাওয়া মানুষের মুখ যাতে সেই বিধানসভার অভ্যন্তরে আমরা রাখতে পারি, যারা মানুষের হয়ে কথা বলবে, সাধারণ জনগণের দাবিদাওয়া নিয়ে কথা বলবে। এই কৃষ্ণনগর শহরের যিনি জনপ্রতিনিধি আছেন, মানুষের কোন কথাটা বিধানসভার অভ্যন্তরে তিনি তুলে ধরেছেন? এখানকার সাংসদ খেটে খাওয়া মানুষের কোন কথাটা লোকসভার অভ্যন্তরে তুলে ধরেছেন? তাহলে এমন জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করা প্রয়োজন যে বিধানসভার অভ্যন্তরে দাঁড়িয়ে এই খেটে খাওয়া মানুষ, সংগঠিত অংশের মানুষ, অসংগঠিত অংশের মানুষ, দিন আনা দিন খাওয়া অংশের মানুষের স্বার্থে, তাদের কাজের স্বার্থে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিধানসভার অভ্যন্তরে দাঁড়িয়ে প্রকৃত ভূমিকা পালন করবে। সেই নির্ধারণ করার দায়িত্ব আমাদের ওপর এসেছে। শুধু আমাদের নয়, আমরা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছি, তার পাশাপাশি আমার পরিবার পরিজন প্রত্যেকে আমার অধিকার বুঝে নেওয়ার সময়, সেই অধিকার বুঝে নেওয়ার ক্ষেত্রে আগামী দিনের লড়াই আন্দোলনে আপনারা যুক্ত থাকবেন, এই প্রত্যাশা, এই আহ্বানটুকু রেখে পুনর্বার প্রত্যেককে সংগ্রামী অভিনন্দন, লাল সেলাম জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

এরপর বক্তব্য রাখেন প্রকাশ্য সমাবেশের অন্যতম প্রধান বক্তা, সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির নেত্রী দেবলীনা হেমব্রম। তিনি পথচলতি মানুষ সহ উপস্থিত সবাইকে সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে আমরা আছি। শ্রমিক, কৃষক, খেতমজুর, কর্মচারী, নারী সমাজ কেউ ভালো নেই। যাঁরা বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে কাজ করেন, তাঁরা কেউ ভালো নেই। তাঁরা নিজেদের যোগ্যতায় চাকরি পেয়েছেন, সরকারের দয়ায় নয়। কিন্তু তাঁদের দাবিদাওয়া নিয়ে ভাবার সময় সরকারের নেই। অথচ লুটেরাদের জন্য বেসরকারী কোম্পানি থেকে প্রকাশ্যে ফাইল ল্যাপটপ ছিনিয়ে নিতে এতটুকুও লজ্জা করে না খোদ মুখ্যমন্ত্রীর। রাজ্যের সরকার উন্নয়নের পাঁচালি বের করেছেন। কিন্তু আসলে কী হয়েছে আমরা সব জানি। অভয়ার মৃত্যুর প্রতিবাদের আপনারা আন্দোলন করেছেন, আমরাও করেছি। সরকারী কর্মচারীরা বঞ্চিত হচ্ছেন, পেনশনাররাও বঞ্চিত হচ্ছেন। কর্পোরেটদের স্বার্থে আপামর মানুষকে জোট বাঁধতে দেবে না বলেই কেউ বলছে মন্দির করো, কেউ বলছে মসজিদ করো। মন্দির, মসজিদ হওয়াতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। আগেও হয়েছে। কিন্তু সরকারী কোষাগারের অর্থ ব্যয় করে কেন হবে? মানুষের রুটি রুজি রোজগার আয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা কে করবে? নির্বাচনের সময় এরা যেমন ব্যালট খায়, এখন তো ফাইলও খাচ্ছে! রাজ্য সরকার বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য কোনো দিশা দেখাচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী সবসময় চিন্তা করছেন কী করে মানুষকে দমিয়ে রাখা যায়। রাজ্যে কল-কারখানা নেই। ছেলেমেয়েরা কাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের যোগ্য শিক্ষকরা দীর্ঘদিন ধরে রাস্তায় আছেন। তৃণমূল-বিজেপিকে তাড়াতে হবে। ক'টা কারখানা বন্ধ হয়েছে? ক'টা স্কুল বন্ধ হয়েছে? ক'টা হোস্টেল বন্ধ হয়েছে? ১০০ দিনের কাজ কেন বন্ধ? কাজ আমাদের অধিকার। কাজ দিতে হবে। আমাদের পথে নামতে হবে। বিজেপি-তৃণমূলকে আমরা কোনো জমি ছাড়ব না। আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। না হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না। বিজেপি-কে তৃণমূলই নিয়ে এসেছে। দুটো দলকেই আমরা পরাস্ত করব। আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন।

এরপর বক্তব্য রাখেন সি আই টি ইউ-এর সর্বভারতীয় নেতৃত্ব এবং একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের প্রধান অতিথি আভাস রায়চৌধুরী। তিনি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নবনির্বাচিত সম্পাদকমণ্ডলী ও উপস্থিত সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, আর এস এস-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের স্বার্থে কাজ করবার জন্যই তৃণমূলের জন্ম দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই রাজ্য সরকারও আপামর শ্রমজীবী মেহনতী গণতান্ত্রিক মানুষের জন্য নীতি গ্রহণ করবে না, করছেও না। নিয়োগ বন্ধ, অস্থায়ী কর্মী, চুক্তিভিত্তিক কর্মী অথবা কোনো বেসরকারী এজেন্সি মারফত কর্মী নিয়োগ করে স্থায়ী পদগুলিকেই কার্যত তুলে দিচ্ছে। যে-কোনো গণতান্ত্রিক মানুষের, সংগঠনের দাবি আদায়ের সংগ্রামের শেষ হাতিয়ার ধর্মঘট। একদিকে, একে আইন করে তুলে দাও। অপরদিকে, দাবি করতে পারে এমন মানুষের সংখ্যা দিন দিন কমাও। এটাই হচ্ছে এদের পরিকল্পনা। এর উল্টোদিকে বামপন্থীরা কী বলছে? কর্মসংস্থানের বিকাশ ঘটাও, শিল্প স্থাপন করো। যুবকরা কাজ পেলে তাদের আয় বাড়বে। নতুন নতুন বাজার তৈরী হবে। ক্রয়ক্ষমতা বাড়লে বাজারের উপরে নির্ভরশীল মানুষের রোজগার বাড়বে। সব মিলিয়ে সামাজিক বিকাশ ঘটবে। কিন্তু এরা শ্রমজীবী মানুষের দাবি করার অধিকারটাই কেড়ে নিতে উদ্যত হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, সরকারের উন্নয়নমূলক কাজকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য সরকারী কর্মচারীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বর্তমান সরকার কী করছে? তারা শ্রমিক-কর্মচারীদের দাবিদাওয়া শুনতেই নারাজ। কাজের অধিকার নিয়ে আইন চালু বামপন্থীরা করে দেখিয়েছিল। ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি আইন কার্যত গটআপ করে তৃণমূল-বিজেপি অকেজো করে দিয়েছে। বর্তমানে তুলেই দিতে চাইছে। তার সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার বিপদ। এই দুই বিপদকেই রুখতে পারে একমাত্র বামপন্থী বিকল্পই। এরা শুধু কর্মচারী সমাজের সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, সমাজের সব অংশের মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাই যে অর্জিত অধিকার হরণ করা হয়েছে, আর যে দাবি পূরণ হওয়া আবশ্যক—দুটোর জন্যই একযোগে লড়তে হবে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আমাদের রাজ্য যে-কোনো রাজ্যের তুলনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকত। এখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্য ক্রমশ অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পেছিয়ে পড়ছে। শ্রমিক, কর্মচারী, মাস্টারমশাইদের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে আপনাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল। আপনাদের সঙ্গে প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত বিশ্বাসঘাতকতা করে যাচ্ছে রাজ্যের তৃণমূল সরকার। শ্রমজীবী মানুষ শ্রম দিয়ে যে কাজ করছে, তা কি 'Service to the nation' নয়? রাজ্য সরকারী কর্মচারীরাও শ্রম ও মেধা দিয়ে যে কাজ করছেন, তা কি 'Service to the nation' নয়? বর্তমানে ছ'লক্ষের মতো শূন্যপদ পশ্চিমবঙ্গে। অস্থায়ী কর্মচারীদের দিয়ে কাজ করিয়ে exploit করা হচ্ছে। তাদেরও স্থায়ী কর্মচারীদের মতো একই কাজ করতে হয়। অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে আপনারা আছেন, আমরাও আছি। এই লড়াই আরও শক্তিশালী করতে হবে। বামফ্রন্টের আমলে পশ্চিমবাংলা ধান উৎপাদন, মাছ উৎপাদন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে ছিল গোটা দেশে। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের, গ্রামের মানুষের উন্নতি সাধন করা হতো। হলদিয়া পেট্রোকেমিকেলস-এর অনুমোদন সাড়ে ন'বছর আটকে রেখেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। সল্টলেকে Electronic Complex সাড়ে চার বছর আটকে রেখেছিল। সিঙ্গুরে কারখানা করতে দেয়নি। এখন চাষীরা ফসলের দাম পাচ্ছে না। আজ বিভিন্ন ব্যাঙ্ককে তুলে দেওয়া হচ্ছে। তার জায়গায় সৃষ্টি হচ্ছে প্রাইভেট ব্যাঙ্কের। কেন আট হাজার স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে? কেন কলেজের সব আসন ভর্তি হয় না? শিক্ষামন্ত্রী দুর্নীতির দায়ে দোষী। মুখ্যমন্ত্রী কেন দুর্নীতিগ্রস্তদের সমর্থন করেন? সেটিং না থাকলে তদন্ত মাঝপথে থেমে যায় কেন? বাংলায় কোনোদিন ভাষার নামে, ধর্মের নামে, জাতের নামে লড়াই ছিল না। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ও বর্তমান রাজ্য সরকারের আমলে এগুলো এসেছে। মানুষের জ্বলন্ত দাবিদাওয়াকে ভুলিয়ে দিতে ধর্মীয় বিভাজন, ভাষার বিভাজন, জাতের বিভাজন আনা হচ্ছে। পরিযায়ী শ্রমিকরা কাজের সন্ধানে ভিন রাজ্যে গিয়ে কখনও লাশ হয়ে ফিরে আসছে। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করা হচ্ছে। আর এস এস-কে আটকাতে হবে। বিজেপি-কে আটকাতে হবে। তৃণমূলকে হারাতে হবে। বাংলাকে বাঁচাতে গেলে বামপন্থীদের আনতে হবে। আপনারা সম্মেলন থেকে নিয়োগকর্তা পরিবর্তনের ডাক দিয়েছেন। আমরাও ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে তাই চাইছি। মানুষ প্রতিদিন অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেয়। □

ইন্দ্রজিৎ রায় চৌধুরী

একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদকের সাক্ষাৎকার

গত ১০-১২ জানুয়ারী, ২০২৬ প্রণব চট্টোপাধ্যায় নগরের (কৃষ্ণনগর শহর) প্রশান্ত সাহা মঞ্চে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন চলাকালীন সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক কাজল সরকারের একটি সাক্ষাৎকারের আয়োজন করা হয়েছিল। সাক্ষাৎকারটি নীচে লিপিবদ্ধ করা হলোঃ

প্রশ্ন ঃ প্রথম যখন এই দায়িত্বের কথা জানলেন তখনকার অনুভূতি কী? কীভাবে শুরু হলো রাজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতি?

উত্তর ঃ নদীয়া জেলায় রাজ্য সম্মেলন সংগঠিত করার চাহিদা বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের পূর্ব থেকেই ছিল। স্বভাবতই সপ্তম রাজ্য কাউন্সিলে একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত করার জন্য নদীয়া জেলার নাম প্রস্তাব ছিল আমাদের কাছে ভীষণ আনন্দের, একই সাথে গর্বের।

রাজ্য কাউন্সিল সভার পরদিন থেকেই স্বপ্ন বোনার কাজ শুরু। প্রথম লক্ষ্য ছিল সদস্য, কর্মী ও তাঁদের পরিবারগুলির সাথে আমাদের দায়িত্বকে আন্তরিকভাবে ভাগ করে নেওয়ার। নিয়মমাফিক সাংগঠনিক সভা ছাড়াও সদস্যদের সাথে ছোট ছোট সভার মধ্য দিয়ে রাজ্য সম্মেলনের বার্তা পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়। অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের সভার দিন তাই সমিতি ভবন হয়ে উঠেছিল জেলার সদস্য কর্মচারীদের কাছে মিলনক্ষেত্র। সেদিন প্রায় ছয় লক্ষ টাকার সম্মেলন তহবিল সংগ্রহের মধ্য দিয়ে একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতির আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।

প্রশ্ন ঃ কৃষ্ণনগর তথা নদীয়া জেলার বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা কী, তাদের অনুভূতিই বা কী?

উত্তর ঃ রাজ্য সম্মেলনকে নদীয়া জেলার মানুষের কাছে নিয়ে যাবার জন্য আমরা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পরিষেবামূলক এবং রাজনৈতিক—এই চার ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলাম। কর্মসূচীগুলিতে এলাকার মানুষের বিপুল সাড়া পাওয়া যায়। কিছু ব্যতিক্রমী কর্মসূচী যেমন মুক্তমঞ্চের আলোচনায় মানুষের প্রশ্ন ছিল সমসাময়িক বিষয় নিয়ে। সাংস্কৃতিক কর্মসূচী নদীয়া জেলায় ভিন্নমাত্রা বহন করেছিল যা সাংস্কৃতিক ভাবনায় নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। পরিষেবামূলক কর্মসূচীতে গ্রামীণ ও প্রান্তিক মানুষের অংশগ্রহণ ছিল সর্বাধিক। শুধুমাত্র রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে নয়, এ ধরনের কর্মসূচীর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ হয়েছে জনমানসের মধ্য থেকে।

প্রশ্ন ঃ সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নদীয়া জেলার যে ঐতিহ্য-পরম্পরা, রাজ্য সম্মেলনে তার প্রভাব। বিশেষ করে লোগো তৈরীর ভাবনা।

উত্তর ঃ নদীয়া জেলার সমাজ সংস্কৃতির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করে লোগোর ধারণা নির্মাণ করা হয়। ভারতীয় আদি আধুনিকতার জন্ম পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে। গৌড়বঙ্গের আদি আধুনিক মাহাত্ম্য স্পষ্ট ধরা পড়ে নগর-চাঞ্চল্য, বণিক সজীবতা, ভ্রমণ পিপাসা, প্রাদেশিকতা থেকে বেরিয়ে বৃহত্তর ভারতে সংযুক্তি, মধ্য নিম্নবর্গের সামাজিক সচলতা, সামাজিক আন্দোলনে বৃহৎ সংখ্যক মানুষের স্তর নিরপেক্ষ অংশগ্রহণ—অনেক কিছু মিলিয়ে চৈতন্যের সময়ে এক ধরনের প্রাক ঔপনিবেশিক আধুনিকতার উদ্বোধন ঘটেছিল। বাংলার প্রথম নবজাগরণ, আদি অকৃত্রিম নবজাগরণের প্রধান হোতা, প্রথম ঋত্বিক চৈতন্যদেব।

আবার চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে নবদ্বীপের মাটিতে দাঁড়িয়ে ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতি স্বগর্বে প্রতিবাদ জানিয়েছিল শাসক কাজীর অনৈতিক নির্দেশনামার বিরুদ্ধে। শাসকশ্রেণীর দুর্বিনীত আচরণের বিরুদ্ধে অহিংস গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন অসংখ্য মানুষ নগর কীর্তনের মধ্য দিয়ে। সেটাই ছিল প্রথম অহিংস গণতান্ত্রিক আন্দোলন। স্বয়ং চৈতন্যদেব ছিলেন সেই আন্দোলনের স্রষ্টা। জাতপাত ভুলে ধর্মীয় গোঁড়ামির চোখ রাঙানিকে সরিয়ে রেখে সকল স্তরের মানুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে যে সমাজ বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল তারই ঐতিহ্য পরম্পরা আজও বহমান, তা ভীষণভাবেই প্রাসঙ্গিক। এজন্যই নদীয়া জেলায় অনুষ্ঠিত একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের লোগোর ভাবনায় চৈতন্যদেবের বিমূর্ত প্রতিরূপ প্রকাশিত হয়েছে সমাজ বিপ্লবের নতুন সম্ভাবনার বিকশিত ভ্রূণের উপর প্রথম সূর্যোদয়ের আভায়।

প্রশ্ন ঃ রাজ্যব্যাপী দীর্ঘ গণআন্দোলনের পটভূমিতে আশির দশকের শেষে প্রথম বামপন্থী সরকার গঠন ও তৎপরবর্তীতে ১৯৮২ সালে এই জেলার কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত হয় সপ্তম রাজ্য সম্মেলন। অভিজ্ঞতা কী?

অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক কাজল সরকারের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন এডিটোরিয়াল টিম

উত্তর ঃ স্বাধীনতার পরবর্তী সময় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য রাজনীতি ও সামাজিক জীবনে দেশভাগের যন্ত্রণা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দগদগে ক্ষত, জমিদারী শোষণ, জমিদার-জোতদার ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বীভৎস আঁতাত; এর ফলে তীব্র খাদ্য সংকট সৃষ্টি হয়। ছিন্নমূল মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই, কৃষকের ফসলের অধিকার লড়াইয়ের মধ্যে আধা ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসকে অতিক্রম করে বামপন্থার প্রতি মানুষের আস্থা গড়ে ওঠে। অনেক জীবনের বিনিময়ে, অনেক লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে নতুন বিকল্প সামনে নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বিকল্প প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্পে মানুষের সাথে সরকারী কর্মচারীরাও শামিল হন। অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজের সকল স্তরের খেটে খাওয়া মানুষের। সেই ''নব আনন্দে জাগো''-র সময় ১৯৮২ সালে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সপ্তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কৃষ্ণনগর শহরে। আজও ৪৩ বছর আগের সেই সপ্তম রাজ্য সম্মেলনের স্মৃতি বহন করে চলেছেন অবসরপ্রাপ্ত কয়েকজন কর্মচারী নেতৃত্ব সহ জেলার প্রবীণ মানুষ, যাঁরা সেই আনন্দযজ্ঞে শামিল হয়েছিলেন। সে সময় বিপুল অংশের কর্মচারীর অংশগ্রহণ আজও স্মরণ করে কৃষ্ণনগর তথা নদীয়া জেলার গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ।

প্রশ্ন ঃ এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে কর্মচারীদের মধ্যে কতটা উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ করা গিয়েছে, বিশেষ করে নতুন অংশের কর্মচারীরা কীভাবে দেখছেন এই সম্মেলনকে?

উত্তর ঃ রাজ্য সম্মেলনের তহবিল সংগ্রহ করতে গিয়ে কর্মচারী ও তাদের পরিবারদের কাছ থেকে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। কোনও কর্মচারীর কাছে তহবিল সংগ্রহ করতে গিয়ে বিমুখতার সম্মুখীন হতে হয়নি। সম্মেলন নির্মাণ করার জন্য প্রাথমিক যে কাজটা ছিল তা অর্থ সংগ্রহের। অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের দিনে কর্মচারীদের উপস্থিতি বুঝিয়ে দিয়েছিল যে যদি আমরা আন্তরিকতা ও দায়িত্বের সাথে কর্মচারীদের কাছে যেতে পারি তবে এই বিপুল দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়ার জন্য সকলে একান্তই আগ্রহী।

প্রাথমিক দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে সম্মেলনের দিন যত এগিয়েছে নানা বিষয়ের কর্মসূচীর মধ্যে সদস্য কর্মচারীদের উপস্থিতির বৃদ্ধি ঘটেছে।

সম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবক হবার আকাঙ্ক্ষা ছিল আকাশচুম্বী। প্রায় দুই শতাধিক কর্মী তাঁদের নিরলস পরিশ্রম ও মেধা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সম্মেলনকে গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। সকলের আন্তরিক সদিচ্ছা ও উৎসাহ ছিল লক্ষণীয়।

জেলার নবীন অংশের কর্মচারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে না থাকলেও তাঁদেরকে সংগঠিতভাবে সম্মেলনের অভ্যন্তরে যুক্ত করার ক্ষেত্রে দুর্বলতা ছিল। এই অংশের কিয়দংশ কর্মচারী ব্যতিক্রমীভাবে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। রাজ্য সম্মেলনের অভ্যন্তরে নবীন কর্মচারী হিসাবে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে সংগঠনের বিস্তার ও তার ব্যাপ্তি সম্বন্ধে একটা সম্যক উপলব্ধি ঘটেছে।

প্রশ্ন ঃ সামগ্রিক পরিকল্পনা, উপসমিতিগুলির কাজের পরিকল্পনা কী কী?

উত্তর ঃ কৃষ্ণনগর শহরে বড় আকারের রাজ্য সম্মেলন সংগঠিত করার জন্য পরিকাঠামোগত সমস্যা ছিল। বিশেষত আবাসন ও মূল সম্মেলনের মঞ্চ হিসাবে বৃহৎ আকারের কোনো প্রেক্ষাগৃহ ও বড় বিদ্যালয় বা লজের অভাবকে অতিক্রম করার জন্য আমরা শুরু থেকেই পরিকাঠামোকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা করেছিলাম। এ কারণে রাজ্য সম্মেলন সংগঠিত করার জন্য দশটি উপসমিতির মধ্যে অন্যতম ছিল পরিকাঠামো উপসমিতি। এছাড়াও বাকি ন'টি উপসমিতির অভ্যন্তরে তাদের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল যা চূড়ান্তভাবে সম্মেলন নির্মাণপর্বে প্রয়োগ করা হয়। তার মধ্যে কয়েকটি উপসমিতি তাদের মৌলিক চিন্তার প্রকাশ সম্মেলনের মধ্যে করেছে। নিজস্ব কর্মীদের কাজের সাথে সরাসরি যুক্ত করে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে সম্মেলনের খাবার পরিবেশন ও সরবরাহ করার কাজ খাদ্য উপসমিতির অভ্যন্তরে সংগঠিত করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে গোটা জেলার স্বেচ্ছাসেবক কর্মী-নেতৃত্বদের শুধুমাত্র যুক্ত করা নয়, তাদের এই কাজের মধ্য দিয়ে যে ঐক্যবদ্ধতার প্রকাশ ঘটেছিল তা সংগঠনের মধ্যে সংঘটিত হবে বলেই আমাদের মনে হয়েছে।

আবাসন নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলি অতিক্রম করার জন্য আমাদের লক্ষ্য ছিল আবাসনের ক্ষেত্রগুলি সংখ্যার দিক থেকে কমিয়ে আনা যাতে গোটা শহর জুড়ে আবাসনগুলিতে সাধ্যমতো পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যায়।

প্রচার ও মঞ্চের ক্ষেত্রে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স-এর ব্যবহার প্রচারের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা এনেছিল।

নদীয়া জেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক উপসমিতির ধারাবাহিক উদ্যোগ ছিল লক্ষণীয়। জেলার অভ্যন্তরে নানাবিধ সাংস্কৃতিক কর্মসূচী সংঘটিত করার মধ্য দিয়ে জেলার অভ্যন্তরে পরিবার-পরিজনদের যুক্ত করে সাংস্কৃতিক চর্চার পরিমণ্ডল গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে।

নদীয়া জেলা তথা কৃষ্ণনগর শহরের প্রাচীন ঐতিহ্যের সাথে গণ আন্দোলনের ভূমিকা নিয়ে প্রদর্শনী গড়ে তোলা এবং বুক স্টলে প্রগতিশীল পুস্তক সম্ভারে বৈচিত্র্য নিয়ে এক সুদৃশ্য এবং মনোজ্ঞ বুক স্টল ও প্রদর্শনী উপস্থাপন করার পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট উপসমিতির মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

গোটা শহর জুড়ে প্রতিনিধিদের আবাসনকে সম্মেলন মঞ্চের সাথে সংযুক্ত করা এবং প্রতিনিধিদের মূল নগর থেকে দূরবর্তী রেলস্টেশন থেকে আসা-যাওয়ার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা স্বেচ্ছাসেবক ও পরিবহন উপসমিতির ক্ষেত্রে প্রধান গুরুত্ব পায়।

প্রশ্ন ঃ রাজ্য সম্মেলন আয়োজনের ক্ষেত্রে বাধাগুলি কী কী ছিল?

উত্তর ঃ কৃষ্ণনগর শহরে বড় আকারে রাজ্য সম্মেলন করার জন্য পরিকাঠামগত বাধাটাই ছিল মূল সমস্যা। বড় প্রেক্ষাগৃহ না থাকায় সম্মেলন স্থলকে মাঠের মধ্যে নির্মাণ করতে হয়। এছাড়া রাজনৈতিক কারণে বিদ্যালয়গুলি সম্মেলনের কাজে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিবন্ধকতা ছিল।

প্রশ্ন ঃ ইতিবাচক অভিজ্ঞতা কী কী? জেলার বাম গণতান্ত্রিক অংশের মানুষ কীভাবে সাহায্য করেছেন? পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির সহায়তা কীভাবে পেয়েছেন?

উত্তর ঃ পরিকাঠামোগত সমস্যা অতিক্রম করতে জেলায় বাম গণতান্ত্রিক শক্তির ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত কৃষ্ণনগর বি.এড. কলেজে আবাসন করার ক্ষেত্রে সেখানকার পরিচালন সমিতি ও অধ্যক্ষ সহ শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও সমর্থন আমাদের কাজকে সহজ করে দেয়।

রাজ্য সম্মেলনের কর্মসূচীগুলিতে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষ থেকে বিপুল অংশগ্রহণ, প্রাণী স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য শিবিরগুলির মধ্য দিয়ে কর্মচারী ও জনগণের মধ্যে যোগসূত্র তৈরী হয়। এছাড়া কর্মসূচীর বিভিন্ন পরিসরে এলাকার গণতান্ত্রিক মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছিল।

সামগ্রিক সম্মেলনের কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে বাম ও গণতান্ত্রিক মানুষের সুপরামর্শ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ আগামী দিনে শ্রেণী আন্দোলনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়ে পরিচালিত হয়েছে।

অভ্যর্থনা কমিটির গঠনের দিন থেকেই পার্শ্ববর্তী জেলা হিসাবে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও হুগলি জেলাকে আমরা সবসময় পাশে পেয়েছি। পার্শ্ববর্তী জেলার সংগ্রামী সহযোদ্ধারা দান মেলায় অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে সরাসরি অর্থ প্রদান যেমন করেছেন তেমনি মুর্শিদাবাদ জেলা সংগঠনের পক্ষ থেকেও রাজ্য সম্মেলনের অর্থ প্রদান, বীরভূম জেলার পক্ষ থেকে আমলকির মোরব্বা পরিবেশন সমগ্র প্রতিনিধিদের রসনা তৃপ্তিতে সহায়তা করছে। রাজ্য সম্মেলনের সংগ্রামী প্রতিনিধি সহ সকল স্বেচ্ছাসেবকদের 'রেড ক্যাপ' প্রদান করে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সংগ্রামী অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছে।

পার্শ্ববর্তী জেলার সহকর্মী সহযোদ্ধাদের প্রতিনিয়ত উৎসাহজনক পরামর্শ আমরা অকাতরে পেয়েছি যা আমাদের বাধাগুলিকে অতিক্রম করতে সহায়তা করেছে।

প্রশ্ন ঃ তহবিল সংগ্রহ, কাজের সাফল্যের জায়গাগুলি কী কী? এই সাফল্যের কারিগর কে বা কারা?

উত্তর ঃ তহবিল সংগ্রহের প্রাথমিক স্তরে কিছু স্থবিরতা থাকলেও শেষ পর্যন্ত সকল স্তরের সহযোগিতায় লক্ষ্যমাত্রাকে অতিক্রম করা গিয়েছে। এক্ষেত্রে সদস্য পরিবার-পরিজনদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দান মেলার দিন আমাদের সন্তানদের টিউশনের উপার্জিত অর্থ প্রদান করার ঘটনা গোটা জেলাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। নদীয়া জেলার কর্মচারী আন্দোলনকে যাঁরা দশকের পর দশক ধরে সমৃদ্ধ করেছিলেন সেই সব অশীতিপর অবসরপ্রাপ্ত সদস্য প্রকৃত অভিভাবকদের মতো তাঁদের সংগ্রহীত অর্থ প্রদান করে তহবিলকে সমৃদ্ধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি সমিতি যাদের সদস্য কম থাকা সত্ত্বেও নেতৃত্বদের সৃজনশীলতার মধ্য দিয়ে তাদের লক্ষ্যমাত্রা থেকে অনেক বেশি তহবিল সংগ্রহ করেছে যা সকলের কাছে উদাহরণযোগ্য হয়েছিল। সমিতিগুলির এই ভূমিকা প্রাথমিক স্থবিরতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে।

প্রশ্ন ঃ এই সাফল্যকে সংগঠনে সংহত করার পরিকল্পনা কী?

উত্তর ঃ রাজ্য সম্মেলনের সামগ্রিক সাফল্য জেলার ঐক্যবদ্ধ কর্মচারী আন্দোলনকে গতিশীল করবে। গোটা জেলা জুড়ে রাজ্য সম্মেলনের কাজ পরিচালনার মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সাফল্যকে সংহত করতে নিজস্ব পরিসরের বাইরে সংগঠনকে বিস্তৃত করার জন্য সার্বিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সুনিপুণ দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে যে সকল নবীন অংশের কর্মচারী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদেরকে সংগঠনের মতাদর্শের আলোকে আলোকিত করে ভবিষ্যতে গড়ে তোলার কাজ আমাদের করতে হবে। □

মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

বন্যায় বিধ্বস্ত হোগলাটরিতে আবাস, পানীয় জলের কল নির্মাণ

আন্দোলনের ময়দান ও মানুষের রুটি-রুজির লড়াই— এই দুইয়ের সমন্বয়েই গড়ে ওঠে প্রকৃত গণসংগঠন। সেই আদর্শকে সামনে রেখে ফের একবার সামাজিক দায়বদ্ধতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করল রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। ৫ অক্টোবর, ২০২৫-এর ভয়াবহ বন্যায় বিধ্বস্ত ধূপগুড়ি ব্লকের গধেয়ারকুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের হোগলাটরি এলাকায় দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বৃহস্পতিবার একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী।

এদিন হোগলাটরিতে একটি আধুনিক পানীয় জল প্রকল্পের সূচনা করা হয় এবং বন্যায় সর্বস্বান্ত ৮টি পরিবারের জন্য নতুন আবাসের ব্যবস্থা করা হয়। প্রায় চার মাস আগে প্রলয়ঙ্করী বন্যায় হোগলাটরি ও সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। প্রশাসনিক স্তরে প্রয়োজনীয় সহায়তা মিলছিল না। সেই পরিস্থিতিতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ালো।

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী বলেন, ‘পঞ্চায়েত বা প্রশাসন যেখানে ব্যর্থ হয়েছে, আমরা সাধ্যমতো সেই খামতি পূরণ করার চেষ্টা করেছি।’ বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক মনোজিৎ দাস, স্থানীয় বাসিন্দা শম্ভু মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন অরূপ চন্দ, অপূর্ব বসু সহ একাধিক কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্ব। এই পুনর্গঠনকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গ সাব অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশন তাদের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী কমরেড প্রণব চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ‘‘দেশ, দশ, দ্বন্দ্ব’’ বইটির লভ্যাংশ বাবদ ২৫ হাজার টাকা সংগঠনের নেতা ও সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক মানস কুমার বড়ুয়ার হাতে তুলে দেয় জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত ডব্লিউ বি এম ও এ-র রাজ্য সম্মেলন মঞ্চে। □

২১তম সম্মেলনের বার্তা দিল দৃপ্ত মিছিল

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ২১তম রাজ্য সম্মেলনকে সফল করার বার্তা দিল প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সুবিশাল মিছিল।

গত ১০-১২ জানুয়ারী, ২০২৬ নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে তিনদিনব্যাপী এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো প্রণব চট্টোপাধ্যায় নামাঙ্কিত নগর, কৃষ্ণনগরে সেন্ট জনস হাউস প্রাঙ্গণের প্রশান্ত সাহা মঞ্চে। গত ৯ জানুয়ারী, ২০২৬ অভ্যর্থনা কমিটির আহ্বানে এক বর্ণাঢ্য মিছিল শহর পরিক্রমা করে।

সম্মেলন স্থল থেকে বেরিয়ে সদর হাসপাতাল মোড় হয়ে, জজ কোর্ট মোড়, পোস্ট অফিসের মোড় ঘুরে, কোতোয়ালি থানার সামনে দিয়ে এ ভি স্কুল মোড়, হাই স্কুল, নেদের পাড়া প্রভৃতি শহরের প্রধান প্রধান দীর্ঘ জনপথ প্রদক্ষিণ করে পুনরায় সম্মেলন স্থলে এসে শেষ হয়। মিছিলের পুরোভাগে ছিল স্ক্যাটার টিম ও বিভিন্ন ধর্মের পোশাকে সজ্জিত হয়ে সম্প্রীতির বার্তাবাহী সংগঠনের কর্মীরা।

অসংখ্য মানুষের দৃপ্ত এই মিছিলের শুরু থেকে শেষ ছিল তীব্র শ্লোগান মুখরিত। হাতে হাতে ছিল অধিকার আদায়ের দাবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ড। গোটা মিছিল ছিল সংগঠনের লাল পতাকায় মোড়া। মিছিলের দু’ধারে দাঁড়িয়ে মিছিলের দাবির সঙ্গে একমত হয়েছেন অসংখ্য সাধারণ মানুষ। বিভিন্ন গণসংগঠনের কর্মী-নেতৃত্ব পুষ্পবৃষ্টি করে বরণ করেন এই মিছিলকে।

মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত রায়, অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক কাজল সরকার ও সভাপতি বাদল দত্ত প্রমুখ। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে শহরে ঢোকার প্রত্যেকটা প্রবেশ পথে ও শহরের প্রতিটি জনবহুল জায়গায় সজ্জিত হয়েছে কবি, সাহিত্যিক ও শহীদদের স্মরণে তোরণ। সম্মেলন স্থলের প্রবেশ তোরণও উৎসর্গীকৃত হয়েছে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণে। □

আশীষ মিত্র

সম্মেলনের রিপোর্টিং সম্মেলনের রিপোর্টিং

প্যালেস্তাইন, ভেনেজুয়েলা সহ গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পুঁজিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, জাতীয় ক্ষেত্রে আর এস এস পরিচালিত বিজেপি সরকারের কার্যকালে কর্পোরেট-হিন্দুত্ববাদের নেক্সাস এবং বিভাজনের রাজনীতিকে ভরকেন্দ্র করে ‘নয়া ফ্যাসিবাদ’ প্রণয়নের চেষ্টা, রাজ্যের সরকারের মহার্ঘভাতা সহ আর্থিক বঞ্চনা, সরকারের বিভিন্ন স্তরের দুর্নীতি, প্রতিহিংসামূলক বদলি, রাজ্য প্রশাসনের অভ্যন্তরে থ্রেট কালচার, কর্মচারীদের ওপর রাজনৈতিক আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং অর্জিত অধিকার রক্ষায় বৃহত্তম কর্মচারী সমাজের সঙ্গে লড়াই-আন্দোলনের মধ্যে থেকে আগামী ২০২৬-এর নির্বাচনে নিয়োগকর্তা পরিবর্তনের লড়াইয়ে সর্বতোভাবে শামিল হওয়ার শপথ নিয়ে **পশ্চিমবঙ্গ সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশনের** ৭৫-৭৬তম বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে হুগলী জেলার ব্যান্ডেল শহরে অনুষ্ঠিত হলো। দু’দিন ব্যাপী এই সম্মেলনের প্রাক্কালে ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ এক বর্ণাঢ্য ও উদ্দীপ্ত মিছিলের পর কমরেড অভিজিৎ দাশ নামাঙ্কিত পুস্তক বিপণীর উদ্বোধন করেন সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক অমর সরকার এবং হুগলী জেলার বৈশিষ্ট্য সমন্বিত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন সমিতির নেতৃত্ব তথা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি মানস দাস। ২০ ডিসেম্বর সকাল ন’টায় রক্তপতাকা উত্তোলন এবং শহীদ বেদীতে মাল্যদানের পর প্রকাশ্য অধিবেশনে স্বাগত ভাষণ দেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ডঃ হিরন্ময় ঘোষাল। সম্মেলন উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য আশীষ ভট্টাচার্য। সমিতি ও গণ আন্দোলনের নেতৃত্ব তথা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র ‘সংগ্রামী হাতিয়ার’-এর প্রাক্তন সম্পাদক প্রয়াত কমরেড প্রণব চট্টোপাধ্যায় লিখিত প্রবন্ধ সংকলন ‘‘দেশ, দশ, দ্বন্দ্ব’’-বইটির উদ্বোধন করেন সমিতির প্রাক্তন নেতৃত্ব ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন পেশ করেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক সুমন ব্যানার্জী। আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন সমিতির কোষাধ্যক্ষ শান্তনু মুখার্জী। খসড়া প্রস্তাবাবলী পেশ করেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক ইন্দ্রনীল দত্ত এবং প্রস্তাবাবলীর সমর্থনে বক্তব্য উত্থাপন করেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক অনিরুদ্ধ সান্যাল। মোট ২১টি জেলা, ৫টি অঞ্চল ও ৬টি বিভাগের পক্ষ থেকে মোট ৩৪ জন প্রতিনিধি ২৭২ মিনিট ধরে প্রতিবেদন, আয়-ব্যয় এবং খসড়া প্রস্তাবাবলীর উপর সমর্থনসূচক বক্তব্য হাজির করেন। ক্রেডেনশিয়াল কমিটির রিপোর্ট পেশ করেন সমিতির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য দেবাশীষ নন্দী। সমগ্র আলোচনাকে ধারণ করে জবাবী ভাষণ দেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক মণিশঙ্কর মণ্ডল।

সম্মেলন থেকে ১২০ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং ২৬ জনকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয় এবং মণিশঙ্কর মণ্ডল সভাপতি, সুমন ব্যানার্জী সাধারণ সম্পাদক এবং শান্তনু মুখার্জী কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। মুখপত্র ‘সংযোগ’-এর সভাপতি নির্বাচিত হন কল্যাণ দাস। □

গত ২৬ ও ২৭ জানুয়ারী, ২০২৬ হুগলী জেলার কমরেড প্রদীপ চ্যাটার্জী নগরের (আরামবাগ শহর) কমরেড অমলময় গুপ্ত মঞ্চে (আনন্দময়ী লজ) অনুষ্ঠিত হলো **পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতির** ৫০তম দ্বি-বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন। এর আগে পর্যন্ত আরামবাগ শহরে কোনো রাজ্য সরকারী কর্মচারী সংগঠনের রাজ্য স্তরের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়নি। সম্মেলনের প্রাক্কালে গত ২৫ জানুয়ারী, ২০২৬ একটি সুশৃঙ্খল, স্লোগান মুখরিত বর্ণাঢ্য মিছিল আরামবাগ শহরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিক্রমা করে। তারপর সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রয়াত সদস্য কমরেড শঙ্কর ভট্টাচার্যের নামাঙ্কিত প্রগতিশীল পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র উদ্বোধন করেন কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা প্রবীর মুখার্জী। সম্মেলনের প্রথম দিন ২৬ জানুয়ারী সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সমিতির অন্যতম প্রবীণ নেতৃত্ব স্মরজিৎ রায়চৌধুরী এবং ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করান সমিতির সভাপতি উৎসর্গ মিত্র। এরপর রক্ত পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদান কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে সম্মেলনের মূল কাজ শুরু হয়।

সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. তরুণ মণ্ডল তাঁর স্বাগত ভাষণে আরামবাগের সামাজিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি মানস দাস। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, সারা দেশে এক স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে দেশের বৈচিত্র্যকে নষ্ট করে একমুখী সমাজ গঠন করা যেখানে ভাষা, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস সবটাই ঠিক করে দেবে রাষ্ট্র। এই রাজ্যেও গত দেড় দশক ধরে সরকার ও শাসক দল সর্বপ্রকার নৈরাজ্য তৈরী করেছে।

সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন হুগলী জেলা ১২ই জুলাই কমিটি, সি আই টি ইউ ও কৃষক সভার পক্ষে যথাক্রমে রামপ্রসাদ হালদার, পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জী ও প্রাক্তন সাংসদ শক্তিমোহন মালিক। সম্মেলনে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সমিতির অন্যতর যুগ্ম সম্পাদক কল্লোল ভট্টাচার্য্য। আয় ও ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন সমিতির কোষাধ্যক্ষ পিনাকী গোলদার। দাবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন সমিতির অন্যতর যুগ্ম সম্পাদক সুখেন্দু সরকার এবং সমর্থনে বক্তব্য রাখেন প্রচার সম্পাদক অতনু ব্যানার্জী। সমিতির রীতি অনুযায়ী সম্মেলনের আয়োজক জেলার আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মাধ্যমিক উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্রী শিউলি কুঁড়েলকে আগামী দু’বছরের জন্য আর্থিক সহায়তা দান করা হয়।

সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত সমিতির মুখপত্র সংভরণের বিশেষ সংখ্যার উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ও সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত রায়। সম্মেলনে ‘যে পথে সমিতির ৫০তম সম্মেলন’ শীর্ষক আলোচনায় কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব স্মরজিৎ রায়চৌধুরী বলেন, সমিতির গঠনপর্বের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে কর্মচারী সমাজের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক ও সখ্যতা গড়ে তুলতে হবে। তবেই কর্মচারীদের ভয়ভীতির জায়গা থেকে উত্তরণ ঘটানো যাবে।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে সুবর্ণ জয়ন্তী সম্মেলন উপলক্ষে সমিতির অবসরপ্রাপ্ত প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতিদের সংবর্ধনা জানানো হয়। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন অভ্যর্থনা কমিটির কার্যকরী সভাপতি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির হুগলী জেলার প্রাক্তন সম্পাদক সুশান্ত ব্যানার্জী। বিভিন্ন জেলা ও অঞ্চল থেকে আগত মোট ১৯ জন প্রতিনিধি সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর বক্তব্য রাখেন। প্রতিনিধিদের আলোচনা শেষে জবাবী ভাষণ দেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ কুমার ঘোষ। উৎসর্গ মিত্র, তাপস কুমার মজুমদার, মহুয়া সাহা ও অভিজিৎ ভট্টাচার্য্যকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সম্মেলন পরিচালনা করেন। সম্মেলন থেকে কল্লোল ভট্টাচার্য্যকে সভাপতি, প্রদীপ কুমার ঘোষকে সাধারণ সম্পাদক এবং পিনাকী গোলদারকে কোষাধ্যক্ষ করে ২৫ জনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী ও ৬৮ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়। □

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির **উত্তর দিনাজপুর জেলার** একবিংশতিতম জেলা সম্মেলন গত ৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির দপ্তর অরবিন্দ ভবনে, কমরেড শম্ভুনাথ চক্রবর্তী মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। একবিংশতিতম জেলা সম্মেলন শুরু হয় এক বর্ণাঢ্য ও দৃপ্ত মিছিলের মধ্যে দিয়ে। রায়গঞ্জ শহরের সুপার মার্কেট থেকে শুরু হয়ে ঘড়ি মোড় পরিক্রমা করে জাতীয় পতাকা সহ রক্তপতাকায় মোড়া ব্যান্ডে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত নিয়ে স্লোগান মুখরিত মিছিল অরবিন্দ ভবনে শেষ হয়। এরপর জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি শিবেশ সিনহা রক্তপতাকা উত্তোলন করেন এবং শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন। এরপর বিভিন্ন সংগঠন, ব্লক/সেক্টর সহ উপস্থিত নেতৃত্ব শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। উত্তর দিনাজপুর জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি শিবেশ সিনহা, সহ সভাপতিদ্বয় উজ্জ্বল চাকী ও সুজিত কুমার দেব এবং নারায়ণ মণ্ডলকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সভা পরিচালনা করেন।

প্রাথমিকভাবে মনন শাখার পক্ষ থেকে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করা হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বাবলু ঘোষ। উদ্বোধক তাঁর বক্তব্যে আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও রাজ্য পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করে, বর্তমানে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের উপর রাজ্য সরকার যেভাবে শোষণ নামিয়ে এনেছে তার উল্লেখ করেন। রাজ্য প্রশাসনে প্রায় ৬ লক্ষ শূন্যপদ পূরণ, চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ, অবিলম্বে রাজ্যে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য সপ্তম বেতন কমিশন গঠন, বকেয়া ৪০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা দ্রুত প্রদান, রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে থ্রেট কালচার, প্রতিহিংসাপরায়ণ বদলি সহ অন্যান্য বেশ কিছু বিষয় উল্লেখ করেন। উদ্বোধনী সমাবেশে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জেলা ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক নির্মল ঘোষ ও পঞ্চায়েত যৌথ কমিটির পক্ষে দেবব্রত রায়। প্রতিনিধি অধিবেশনের শুরুতে প্রতিবেদন পেশ করেন জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ফাল্গুনী সমাজদার, আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ শিবাশীষ মজুমদার। সম্মেলন থেকে দাবিদাওয়া সংক্রান্ত প্রস্তাব সহ মোট পাঁচটি প্রস্তাব পেশ ও গ্রহণ করা হয়। সম্মেলনে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির উত্তর দিনাজপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত ১৫টি সংগঠন ও ১টি সহযোগী সংগঠন, মোট পাঁচটি ব্লক ও ২টি সেক্টরের মোট ১১৩ জন প্রতিনিধি (১৭ জন মহিলা সহ) উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে থেকে মোট ১২ জন প্রতিনিধি (৩ জন মহিলা সহ) প্রতিবেদন, আয়-ব্যয়ের হিসাব ও প্রস্তাবের উপর আলোচনা করেন। সম্মেলন থেকে আগামী তিন বছরের জন্য মোট ৩০ জনকে নিয়ে জেলা কমিটি এবং আশিস করকে সভাপতি ও ফাল্গুনী সমাজদারকে জেলা সম্পাদক নির্বাচিত করে ৯ জন পদাধিকারী সহ ১৬ জনের জেলা সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়। □

কৃষি কারিগরী কর্মী সংস্থার ৫৩তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো বীরভূম জেলার সিউড়ি শহরে কমরেড সুশীল ঘোষ নামাঙ্কিত নগরে, কমরেড স্বপন দাস ও কমরেড বিকাশচন্দ্র মণ্ডল মঞ্চে বিগত ১৩-১৪ ডিসেম্বর, ২০২৫। মহতী সম্মেলন উপলক্ষে ১২ ডিসেম্বর, ২০২৫ এক সুসজ্জিত মিছিল সিউড়ি শহর পরিক্রমা করে। পরবর্তীতে কমরেড কমলেন্দু চ্যাটার্জী নামাঙ্কিত প্রগতিশীল পুস্তক বিপণন কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সহ-সম্পাদক প্রবীর মুখার্জী। এরপর ‘স্মরণে সলিল সুকান্ত’-কে কেন্দ্র করে মূল্যবান উপস্থাপনা ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট শিল্পী শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার।

সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক অতনু দাশগুপ্ত। আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ জয় নিয়োগী। সম্মেলনে অভয়ার ন্যায় বিচার ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে এবং রাজ্য জুড়ে ঘটে চলা থ্রেট কালচারের বিরুদ্ধে মোট ১৩টি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। উপস্থিত ৫জন মহিলা সহ ২২১ জন প্রতিনিধির মধ্যে ২১ জন সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও প্রস্তাবাবলীর ওপর আলোচনা করেন। সমস্ত আলোচনাকে সূত্রায়িত করে জবাবী বক্তব্য রাখেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক রুদ্রকান্ত ভট্টাচার্য। সম্মেলন থেকে মানস দাসকে সভাপতি, অতনু দাশগুপ্তকে সাধারণ সম্পাদক ও অর্ণব দত্তকে কোষাধ্যক্ষ করে ২৬ জনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী ও ৬৫ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। প্রগতিশীল পুস্তক বিপণন কেন্দ্র থেকে ৩৫ হাজার টাকার বই ক্রয় করেন সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিরা। সম্মেলন পরিচালনা করেন মানস দাস, নজরুল ইসলাম ও বিদেশ বেরাকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। এছাড়াও সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সি আই টি ইউ জেলা সম্পাদক, ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক সহ অভ্যর্থনা কমিটির কার্যকরী সভাপতি সৌমেন চ্যাটার্জী ও অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক কৃষাণু চ্যাটার্জী। □

Editor : SUMAN KANTI NAG
SANGRAMI HATIAR
State Co-ordination Committee
53rd Year, 8th & 9th Edition, December '25-January, 2026
Regd. No. : 18484/71

সাংস্কৃতিক কর্মসূচী

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতিসমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের অন্তর্বস্তু ও বহিরঙ্গের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে নদীয়া জেলার বিভিন্ন গণসংগঠনের সাংস্কৃতিক শাখা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এক হৃদয়গ্রাহী পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল সম্মেলন নির্ধারিত তিনদিনের সন্ধ্যায়।

বর্তমান সময়ে কেন্দ্র ও রাজ্য—উভয় স্তরেই 'সংস্কৃতি' রক্ষার নামে যে অপসংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তা আসলে ক্ষমতাশীল শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রকল্প। সংস্কৃতিকে এখানে মানুষের বহুমাত্রিক জীবনচর্চা হিসাবে না দেখে একরৈখিক, সংকীর্ণ ও

কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক টিমের পরিবেশনা

শাসক-স্বার্থসর্বস্ব পরিচয়ে বন্দী করা হচ্ছে। ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, খাদ্যাভ্যাস কিংবা পোশাক—সবকিছুই শাসকের পছন্দমতো সংজ্ঞায়িত হচ্ছে, আর ভিন্নতা মানেই সন্দেহ, দমন বা দেশদ্রোহের তকমা । এই অপসংস্কৃতি মূলত শ্রমজীবী মানুষের বাস্তব সমস্যাগুলি আড়াল করার হাতিয়ার। বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ভাঙন—এসব প্রশ্ন চাপা দিতে সংস্কৃতির নামে বিভাজনের রাজনীতি জোরদার করা হচ্ছে। ধর্ম, জাত, অঞ্চল বা লিঙ্গের ভিত্তিতে মানুষকে আলাদা করে শাসন করা সহজ হচ্ছে। এতে সংস্কৃতি আর মুক্তির ভাষা থাকে না; তা হয়ে ওঠে নিয়ন্ত্রণের অস্ত্র, আধিপত্যবাদের রাজনীতি। আমরা যারা ট্রেড ইউনিয়ন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত তারা সংস্কৃতিকে দেখি মানুষের সংগ্রাম, সৃজনশীলতা ও পারস্পরিক সংহতির প্রকাশ হিসাবে। সংস্কৃতি কখনোই একচেটিয়া হতে পারে না; তা গড়ে ওঠে মানুষের দৈনন্দিন শ্রম ও লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে। তাই আজকের কর্তব্য এই চাপিয়ে দেওয়া অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা—বহুত্ববাদী, গণতান্ত্রিক ও শোষণমুক্ত সংস্কৃতির পক্ষে দাঁড়ানো। সংস্কৃতি তখনই জীবন্ত, যখন তা মানুষের মুক্তির পথে সহযাত্রী হয়।

জেলা সাংস্কৃতিক টিমের পরিবেশনা

কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'আমার সোনার বাংলা' গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত, যা মূলত ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা, সাম্প্রতিক সময়ে (২০২৫ সালের অক্টোবর-নভেম্বর) ভারতের আসামে কংগ্রেস নেতা বিধুভূষণ দাসের একটি দলীয় সভায় এই গানটি গাওয়ার পর, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা একে 'ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি' এবং 'বাংলাদেশী তুষ্টিকরণ' বলে অভিযোগ করেন। বিজেপি অভিযোগ তোলে যে, কংগ্রেস বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল। এই গান গাওয়া নিয়ে তীব্র রাজনৈতিক ও আইনি বিতর্ক তৈরী হয়েছে, যখন বিজেপি সরকার এটিকে ''বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত'' হিসাবে উল্লেখ করে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা ও আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। অবশ্য এর বিরুদ্ধে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের অংশ হিসাবে আমরাও ''আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'' গানটি গেয়েই প্রতিবাদে শামিল হয়েছি। পরিস্থিতির এইরকম উপাদানের মধ্যেই নদীয়া জেলার সাংস্কৃতিক উপসমিতি ও অভ্যর্থনা কমিটি তাঁদের

শিল্পী রিয়া দে

সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত ভাবনার সফল রূপায়ণের মাধ্যমে যে ভিন্ন মাত্রার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসূচী উপস্থাপিত করেছিলেন তার জন্য তাঁদের সংগ্রামী অভিনন্দন ও লাল সেলাম জানাই। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক কর্মসূচী শুধু শ্রোতা দর্শকদেরই মনোরঞ্জন করেনি, সম্মেলনের মর্যাদা, গুরুত্ব ও ভাবগম্ভীরতাকেও বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে।

৯ জানুয়ারী, ২০২৬ সম্মেলন মঞ্চ থেকে শুরু করে কৃষ্ণনগর শহরের বিভিন্ন অংশ পরিক্রমা করে সুশৃঙ্খল ও সুবিশাল মিছিল শেষে কমরেড অভিজিৎ দাস নামাঙ্কিত প্রগতিশীল পুস্তক বিপণী কেন্দ্র ও নদীয়া জেলার ঐতিহাসিক পটভূমিকাকে কেন্দ্র করে যে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল, তার উদ্বোধনের পর সম্মেলন মঞ্চেই সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী রিয়া দে। সঙ্গে স্প্যানিশ গীটারে ছিলেন রাহুল ও কাজন-এ ছিলেন দিগন্ত। বামপন্থী পরিবারের মেয়ে এবং ছাত্র ও যুব আন্দোলনের কর্মী রিয়া দে-কে পুষ্পস্তবক ও স্মারক দিয়ে সম্বর্ধিত করেন অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক কাজল সরকার। রিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সলিল চৌধুরী, হ্যারি বেলাফন্টে, শাহ আব্দুল করিম-এর বিভিন্ন গানের ডালি সাজিয়ে মোট নয়টি গান পরিবেশন করেন। এরপর প্রখ্যাত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে 'শীতলপাটি' নাটকটি, একক অভিনয় ও নির্দেশনায় পরিবেশন করেন অভিনেত্রী সঞ্জিতা। গ্রাম বাংলার সমাজ জীবনের চালচিত্র সম্বলিত, পঞ্চাশের মন্বন্তর কালপর্বে এক গ্রাম্য মহিলার বেঁচে থাকার সংগ্রামকে মঞ্চে মূর্ত করে তোলেন সঞ্জিতা, তাঁর পাপেট সহযোগে একক অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে। নিজের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়েই মানব সমাজের জয় সূচিত হবে—এই বার্তাই সঞ্জিতা তাঁর নাটকের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর অসামান্য অভিনয় দর্শকদের প্রশংসা আদায় করে নেয়। নাটক শেষে শিল্পীকে পুষ্পস্তবক ও স্মারক দিয়ে অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষ থেকে সম্বর্ধিত করা হয়।

১০ জানুয়ারী, ২০২৬ সন্ধ্যায় পরিবেশিত হয় শ্যামাকান্ত দাস রচিত, ইন্দ্রনীল সেন নির্দেশিত এবং ''কল্যাণী দর্পণ নাট্যসংস্থা'' আয়োজিত সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী নাটক 'গুলশন'। বর্তমানে বিভাজনের রাজনীতি আমাদের

নাটক ঃ শীতলপাটি

সমাজজীবনকে যেভাবে কলুষিত করছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ এই নাটক। ধর্মপরিচয়ের ঊর্ধ্বে মানবতা, মনুষ্যত্বই জয়লাভ করে—এই বক্তব্যই নাটকটির মধ্যে দিয়ে পরিস্ফুটিত হয়। নাটক শেষে নাটকটির নির্দেশক ইন্দ্রনীল সেন মহাশয়কে অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক ও স্মারক দিয়ে সম্বর্ধিত করা হয়।

১১ জানুয়ারী, ২০২৬ সন্ধ্যায় পরিবেশিত হয় একটি ভিন্ন স্বাদের সঙ্গীতানুষ্ঠান—'বাউল আঙ্গিকে লালন গীতি'। পরিবেশন করেন ''সুভদ্রা শর্মা ও সম্প্রদায়''। বাংলার লোকশিল্পের একটি অন্যতম আঙ্গিক বাউল গান, যা রচিত হয় বাউল দর্শনের উপর ভিত্তি করে, সেই বাউল দর্শনের শ্রেষ্ঠ রূপকার লালন ফকির, যিনি জাত-পাত, ধর্মীয় মৌলবাদ ও গোত্রীয় ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। সেই লালন ফকিরের গান, যা আজকের সময়ে বেশি বেশি করে প্রাসঙ্গিক, সেই রকম গান পরিবেশন করে শ্রোতৃমণ্ডলীকে মাতিয়ে দেন—''সুভদ্রা শর্মা ও সম্প্রদায়''।

সুচিন্তিত, সুন্দর ও সুস্থ তিনটি সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা উপহার দেওয়ার জন্য রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটি ও সাংস্কৃতিক উপসমিতিকে পুনর্বার জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন ও লাল সেলাম।

এ প্রসঙ্গে যে কথাটা না বললে এই প্রতিবেদন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, তা হলো সম্মেলন মঞ্চে বিভিন্ন সময়ে যাঁরা সঙ্গীত পরিবেশন করে প্রতিনিধিদের উদ্বুদ্ধ করেন তাঁরা হলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক শাখা, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নদীয়া জেলার সাংস্কৃতিক শাখা, নবদ্বীপ রবীন্দ্রায়ন এবং নদীয়া জেলার কর্মচারী পরিবারের সদস্যাবৃন্দ। এই সমস্ত সংস্থা ও শিল্পীদেরও সংগ্রামী অভিনন্দন ও লাল সেলাম জানাই। □

রাজীব বসু

রাজ্য সম্মেলনের বিশেষ কিছু মুহূর্ত

রাজ্য সম্মেলনের সদস্য পরিবারের অংশগ্রহণ

মিনিটস্ কমিটি

বুক স্টলের উদ্বোধন

সভাপতিমণ্ডলী

সম্পাদক ঃ সুমন কান্তি নাগ
সহযোগী সম্পাদক ঃ বিদ্যুত দাস
যোগাযোগ ঃ
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত।